সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০১৫

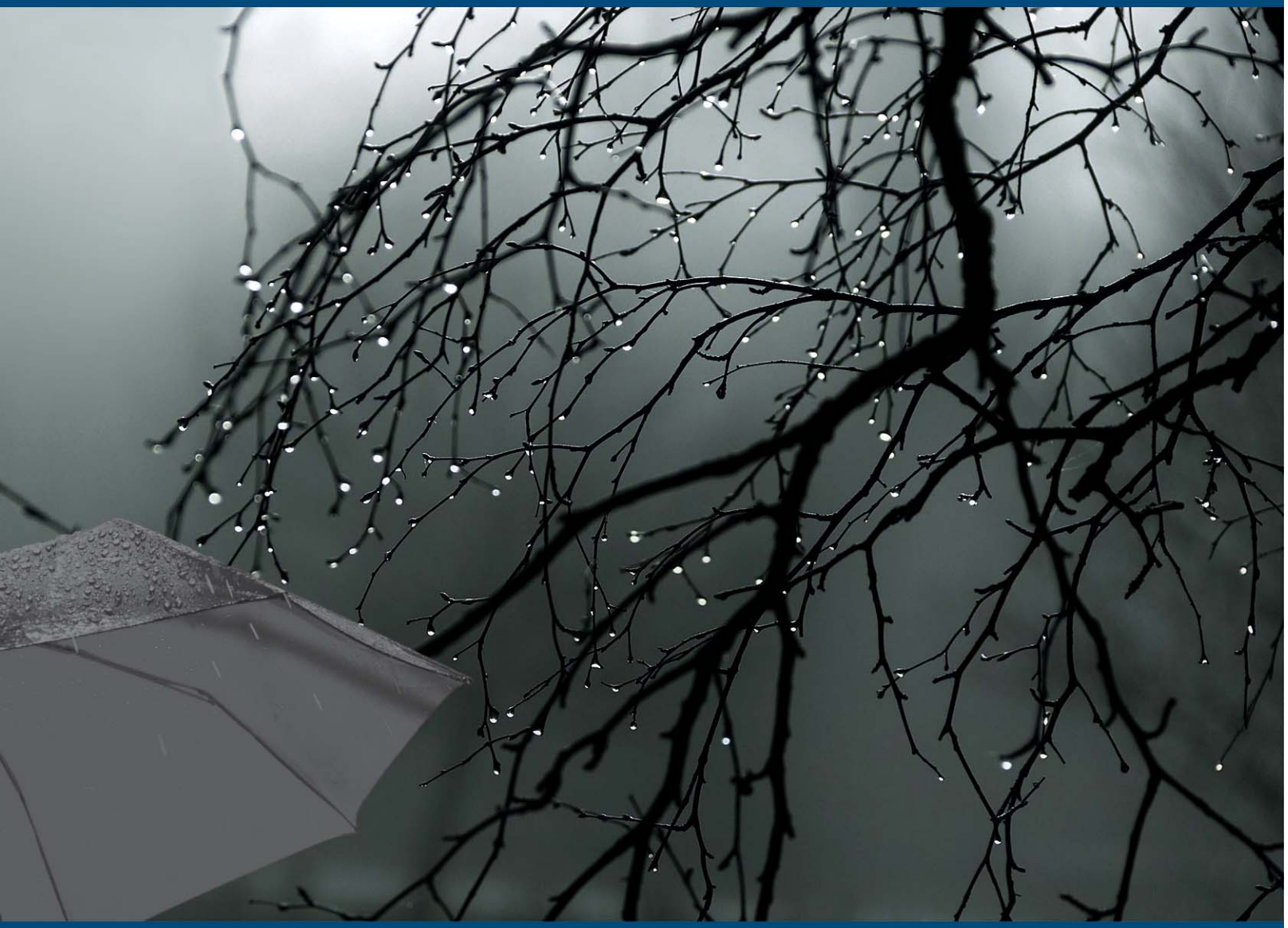

বর্ষার এই দিনে...

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

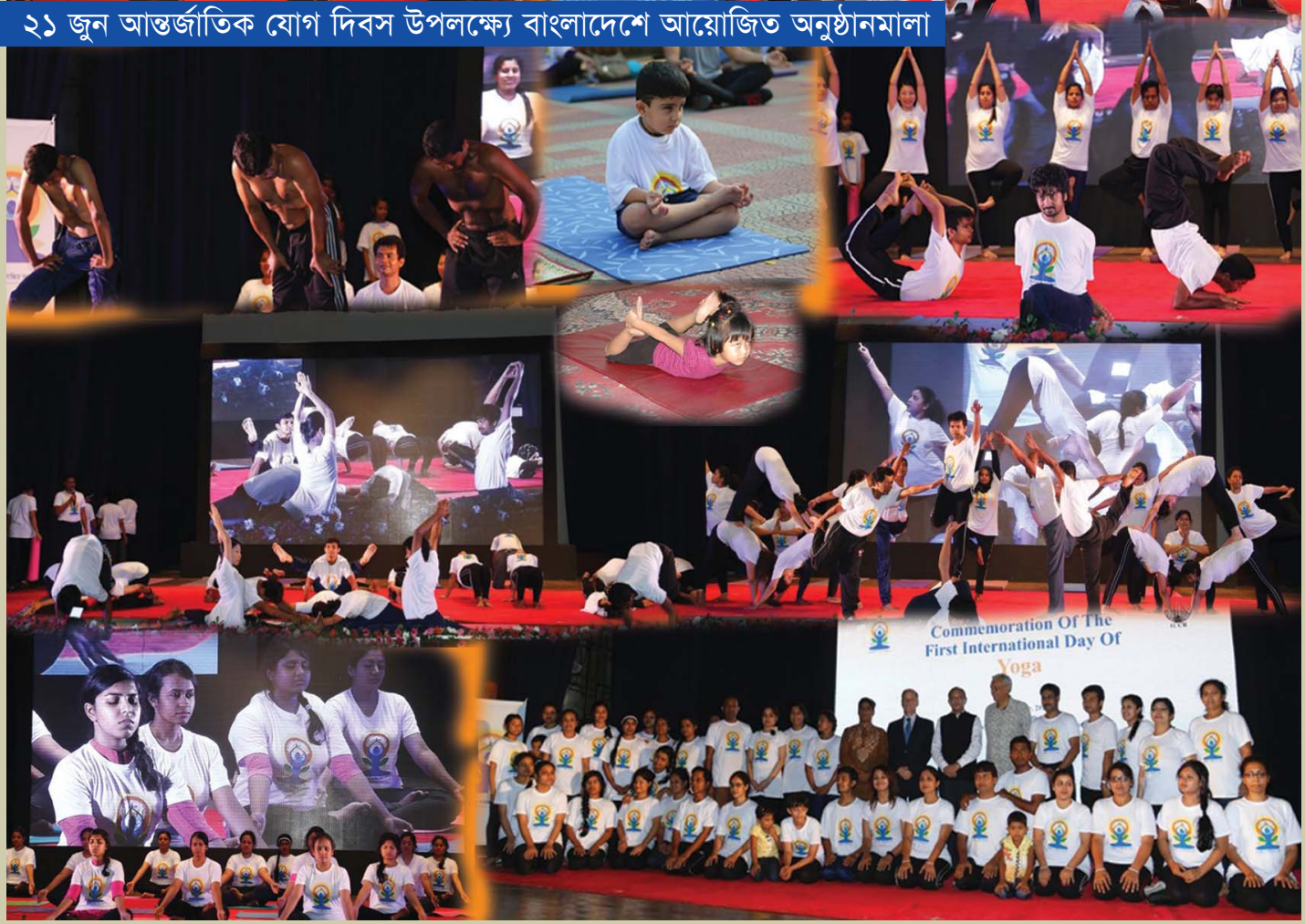

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

www.hcidhaka.gov.in
Gbdfcppl !qbhf;! !0JoejbJoCbohmbefti <! !A ji dei bl b
JHDD!Gbdfcppl !qbhf;! !0JHDDEi bl b
Bharat Bichitra
Gbdfcppl !qbhf;! 0JoejbJoCbohmbefti Ci bsbuCjdi jusb

বর্ষ তেতাল্লিশ । সংখ্যা ০৭ । আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২২ । জুলাই ২০১৫

সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ দৌলতাবাদ ভ্রমণ

সূচিপত্র

প্রতিভা বসু : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ০৪
সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ০৭
ছোটগল্প: মহিমের জোড়াবলদ ১০
একরোখা সুলতানের খেয়ালিপনা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ দৌলতাবাদ ভ্রমণ ১৪
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ১৮
ছোটগল্প: হাঁপের টান ২১
কবিতা ২৪
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্প বৈচিত্র্যের সময়কাল ২৬
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ৩৩
অনুবাদ গল্প: ভাঙা খেলনা ৩৯
কেরালার মেঘ ৪৪
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৪৭
শেষ পাতা: কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ৪৮

৪৪

কেরালার মেঘ

কেরালার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় সবগুলো পর্যটন কেন্দ্রেই যে ব্যাপারটি সবসময় দেখেছি তা হল 'আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞতা'। আয়ুর্বেদ শব্দটি গঠিত হয়েছে দু'টি সংস্কৃত শব্দ মিলে। আয়ু মানে জীবন আর বেদ মানে বিজ্ঞান। এটি বিকল্প চিকিৎসার একটি পদ্ধতি যা ভারতে অনুশীলিত হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। আপনার বাজেট য্যাই হোক, কোন না কোন একটি আয়ুর্বেদিক কেন্দ্র মিলে যাবে আপনার পছন্দমত আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। আর আয়ুর্বেদিক মালিশ উপভোগের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে বর্ষাকাল।

আমি কোভালম বেড়াতে গিয়েছিলাম এরকম এক বর্ষার দিনে। কোভালম রাজ্যটির আয়ুর্বেদিক গন্তব্যগুলোর মধ্যে আদর্শস্বরূপ। আয়ুর্বেদিক কেন্দ্রটিতে কেরালাশৈলীর লাল্লই টের সারি সারি কুটির আছে যেগুলো থেকে আরব সাগর দেখা যায়। থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় ভেষজ ওষুধপত্র। দুধ আর ঘি হল আয়ুর্বেদের কয়েকটি সাধারণ উপাদানের অন্যতম।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮৫০২৯৮৮২৫৫ ৫, f.n bjm;!jogpa bA i djei bl b/hpw/jo

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

আমরা বরপুত্র তব...

আমরা বরপুত্র তব, যাহাই দিবে তাহাই লব
তোমায় দেব ধন্য ধ্বনি, মাথায় বহি সর্বনাশ/
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

ভারত বিচিত্রার ২০১৪ সালের আগস্ট সংখ্যায় ভারতের লেখক অতুল পালের লেখা 'নজরুলের শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবী' নামে লেখাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটি মনে পড়ল। বাংলাদেশে কব্বি সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাওয়ালের স্বভাবকবি দারিদ্র্যের তাড়নায় লিখেছিলেন, হে আমার স্বদেশবাসী তোরা আমার মৃত্যুর পরে চিতায় দিবি মঠ। একথাটা শুধু গোবিন্দচন্দ্র দাসের বেলায়ই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশের বেলাতেও প্রযোজ্য। জীবনানন্দ দাশ তো অল্প পয়সায় যাতায়াতের জন্য ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর চরণ দু'খানি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর শিৰকদের বেতন দিতে গিয়ে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর গয়না বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু কি তাই, পয়সার জন্য নাট্যদল নিয়ে তিনি সারা ভারত চষে বেড়াবার সময় মহাত্মা গান্ধী কবির হাতে ৫০,০০০/ (প ঞ্চাশ হাজার) টাকা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এই সত্তর বছর বয়সে গুরুদেব আপনি এই শ্রমসাধ্য ব্যাপার থেকে অবসর নিন। আর নজরুলকে রিক্তহস্তে ভিক্ষার পাত্র হাতে কত স্বজন, ধনী, দরিদ্র ও গালভরা কণ্ঠের বাক্যবাগীশদের দুয়ারে ঘুরতে হয়েছে তা অতুলবাবু সবিস্তারে তুলে ধরতে কার্পণ্য করেননি। তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে অসহায় কবির– হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জোর করে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ভরণ পোষণ আহারবাস স্থান এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদের জন্য নির্দিষ্ট নিরুপদ্রব বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্লেসময় কবি গুরু ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রিয় কাজীর এহেন কষ্ট লাঘবে তিনি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতেন। বিদ্রোহী কবিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে তিনি নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। বাঙালির ভীরুতাকে কটাক্ষ করে যিনি ধিক্কার দেন, 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'– সেই বাঙালির এহেন ক্লীবতায় কবি নিশ্চয়ই নীরব থাকতেন না। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি শহীদের রক্তদান এবং ৪ লাখ মা বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্যেও বঙ্গবন্ধু কবিগুরুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের মধ্যে সবুজের অভিযানের পদধ্বনি কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন? তাই নতুন করে বাঙালির জয়গাথা আপনাকে লিখতে হবে। অবশ্য কবিগুরু বহু পূর্বেই সেই জয়গাথা লিখে গিয়েছেন, 'সুরলোকে বেজে ওঠে শংখ/ নরলোকে বাজে জয়ডংক/ এল মহাজনমের লগ্ন / অমরাবতীর দুর্গতোরণ যত/ ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।' 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতুহলভরে' যিনি লেখেন, তাঁর রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি একদিন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবে– এ যেন দূরদর্শী কবি অনুভব করতে পেরেছিলেন।

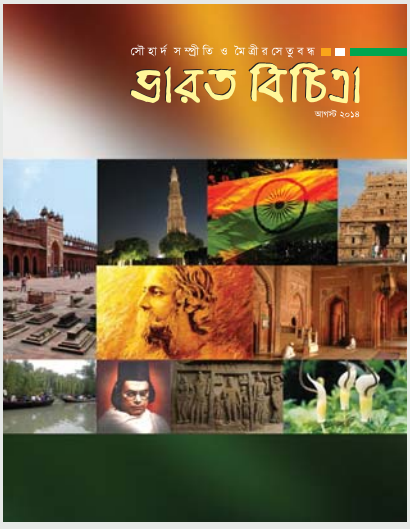

এ প্রসঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে জবরদস্তিমূলকভাবে কবির দেহে অস্ত্রোপচারের কথাটি এসে যায়– *ভারত বিচিত্রার* সম্পাদক বিষয়টির প্রতি আলোকপাতও করেছেন। সেই সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও মেডিকেল বোর্ডের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে তরুণ চিকিৎসক ড. বিধানচন্দ্র রায় একটু বেশি রকমের ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ শল্যচিকিৎসায় রাজী ছিলেন না। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি স্থানে রাখা রবীন্দ্রনাথের স্মারক জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁর ব্যবহৃত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ওষধ এবং এসব ওষুধ সংরক্ষণের জন্য একটি খুব সুন্দর বাক্স লৰ্য করেছি। তাতে বোঝা যায়, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু নিয়তির লিখন কে খণ্ডাতে পারে! 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' লিখলেও মৃত্যুভীত রবীন্দ্রনাথকে এভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে।

অপর দিকে নজরুলের চিকিৎসার সময়ও লৰ্য করেছি বিতর্ক। তাঁকে চিকিৎসার জন্য জেনেভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সময় ড. অশোক বাগচি নামে একজন চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে যান। কিন্তু সব ব্যাধিই কি আরোগ্য হয়? আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লেখা আছে, সব ব্যাধিই নিরাময়যোগ্য নয়। তাই শেষ পর্যন্ত বিধিলিপি

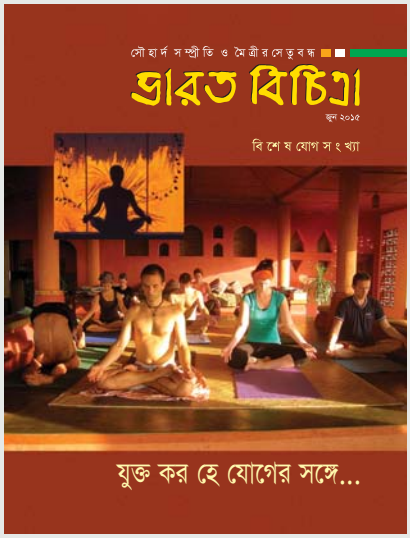

কথাটাকেই মেনে নিতে হয়। যেমনটা রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর শবযাত্রায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃংখলা দেখা দেওয়ায় রথীন্দ্রনাথের শ্মশানে উপস্থিত হবার আগে তড়িঘড়ি করে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) তাঁর মুখাগ্নি করেন। এরকম ঘটনা আমরা নজরুলের শেষকৃত্যানুষ্ঠানেও লক্ষ্য করি। নজরুলের মৃত্যুর সময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সব্যসাচী পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেবার অভিপ্রায় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে বিমানযোগে তিনি রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু বিমান ঢাকা পৌঁছবার আগেই ঢাকা কর্তৃপৰ কবিকে সমাহিত করে ফেলেন। সব্যসাচী সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনায় খুব মর্মাহত হন। অবশেষে সমাধিক্ষেত্র থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে তিনি কলকাতা ফিরে যান।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনে পাকিস্তান সরকার বৈরীভাব পোষণ করে। পক্ষান্তরে সর্বস্তরের বাঙালি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষ পালন করেন। এর মাত্র দশ বছর পরে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে আর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার উদ্যোগে হাজার কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতে আজ সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত। তেমনি নজরুলও চল্ চল্ চল্ বলে নওজোয়ানদের ডাকছেন। রবীন্দ্র নজরুলের জন্য ভূপেন হাজারিকার সেই বিখ্যাত গান 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল...' আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ বেজে চলেছে।

সমীররঞ্জন শীল নিকেতন, ঢাকা

সম্পাদকীয়

মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের সেই মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে বলে। কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে, হতাশ্বাস। এমন সময় হঠাৎ কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেলল। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভেতর থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল। অর্ধেক রাতে দেখি, দরজাগুলো খড়ু খড়ু শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর, গির্জার ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে। সকালবেলায় জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল, রৌদ্র আর উঠল না। এই বাদলায় কিছু করতে মন চায় না। বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। আদিযুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লৰকোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ্নবি স্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে যেন মগ্ন চৈতন্যে এসে করাঘাত করল। যেন সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠলাম। রূপনারানের কুলে জেগে ওঠার মত ব্যাপার যেন।

লিপিকায় এমনই এক বাদলঘন দিনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ– *একটি দিন* শিরোনামে। বর্ষার দিনের এমন অপরূপ চিরকালীন চিত্র বুঝিবা তিনিই আঁক তে পারেন শুধু।

> "মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।
>
> ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম। পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।
>
> বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।
>
> এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।
>
> ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোট একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মত কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।"

একশো বছর পেরিয়ে গেল প্রায়। তবু লেখাটি যেন মনে হয় গতকালের। কবির জয় এখানেই।

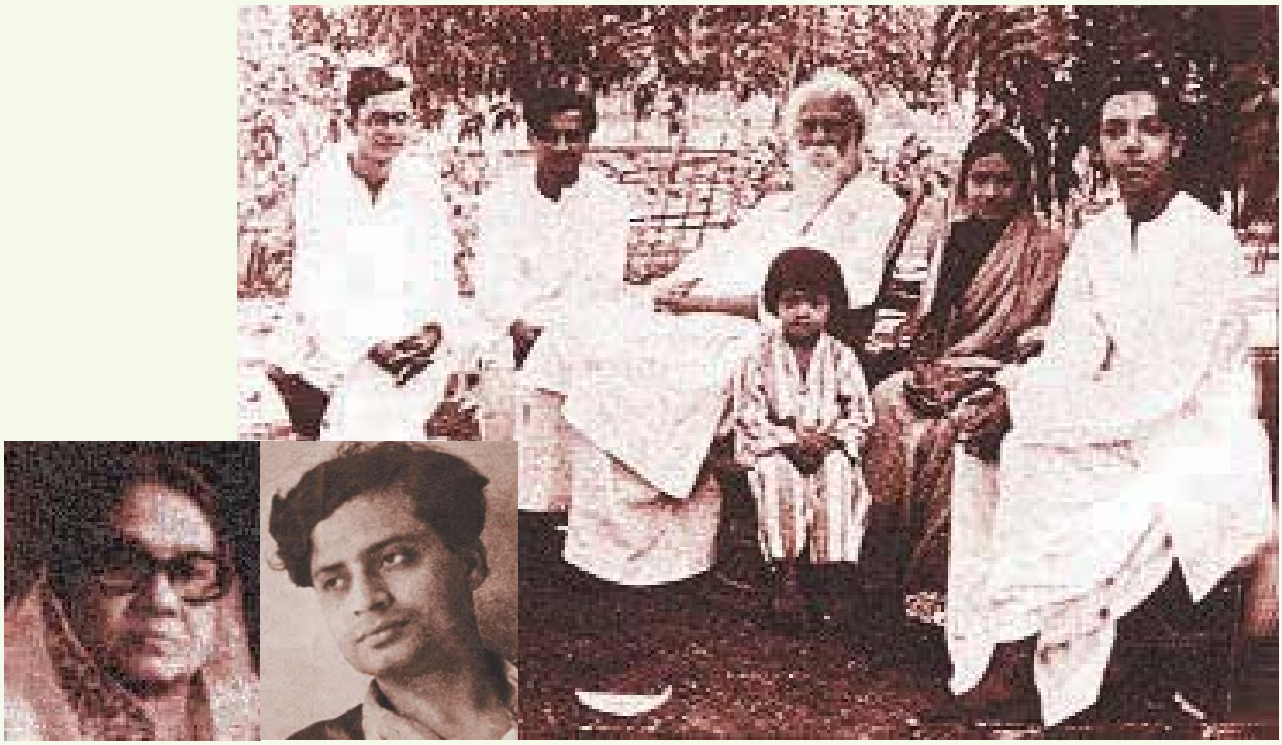

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে স্বামীকন ্যার সঙ্গে প্রতিভা বসু

প্রবন্ধ

প্রতিভা বসু : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মীনাক্ষী সিংহ

একশো বছর পার হল, তবু বিস্মৃত নয়– চিরস্মৃত অনুভবে তিনি পাঠকের হৃদয়ে জেগে আছেন। প্রেমের যাদুতে তিনি মোহনিয়া আবেশ রচনা করেন, রোমান্টিক আমেজে পাঠকদের মন ভরান– তিনি প্রতিভা বসু।

আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম অবিভক্ত বাংলার ঢাকার বিক্রমপুর জেলার হাঁসাড়া গ্রামে। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নালোকে জন্মানো সেই কন্যা তাঁর মায়াবী লেখনীতে রচনা করেছেন আলোকিত জ্যোৎস্নার গান, প্রেমের মধুবর্ষী অনুভব।

জীবনের প্রান্তবেলায় রচনা করেছেন গবেষণাঋদ্ধ বিস্ময়কর গ্রন্থ– *মহাভারতের মহারণ্যে*। সেটি অন্য বর্গের সাহিত্যসৃজন। সেই অনন্য ব্যতিক্রমী রচনা ছাড়া লিখেছেন অনুপম স্মৃতিআলেখ্য– *জীবনের জলছবি*। কিন্তু তাঁর খ্যাতি ও বিপুল জনপ্রিয়তা প্রধানত প্রেমের অনুপম চিত্রণে।

তাঁর জীবনও ছিল রোম্যান্সের মাধুরীতে ভরা। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় সেই প্রেমেরই রোম্যান্টিক সুষমাময় পরিণতি।

সরযূবালা ও আশুতোষ সোমের প্রতিভাময়ী কন্যা রাণু কিশোরীবেলা থেকেই ঢাকায় পরিচিত জনপ্রিয় নাম। তাঁর সুধাকণ্ঠে লাবণ্য তখন ছড়িয়ে পড়েছে। স্বয়ং নজরুল তাঁকে গান শিখিয়েছেন। প্রতিভা নামকে সার্থক করে রাণু সোম সেই কিশোরীবেলাতেই অনন্যসাধারণ গায়িকারূপে খ্যাতি পেয়েছেন।

নজরুল গান শেখাচ্ছেন রাণুকে, পাশে মা সরযূবালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র বুদ্ধদেব বসু তখনই নবীন অধ্যাপক ও কবি হিসেবে খ্যাতিমান। সেই তরুণ অধ্যাপককে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর *তিথিডোর* উপন্যাসের সত্যেনের মধ্যে। প্রণয়প্রার্থী বুদ্ধদেব প্রতিভার পাণিগ্রহণের জন্য তাঁর বাবামা কে বলেছিলেন– 'আপনারা অনুমতি করলে এ বাড়িতে একটা বিয়ে হতে পারে। অবশ্য, রাণুর যদি মত থাকে।'

এই অভিনব আধুনিক প্রস্তাব বুদ্ধদেবকেই মানায় আর এরই পরিণতিতে সেদিন যাত্রা শুরু হয় এক আধুনিক দাম্পত্যের। সেটা ১৯৩৪ সাল। এরপর কলকাতায় তাঁদের যুগলজীবনের সংসার শুরু এবং কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউএর ২০২ নং বাড়িটি *কবিতা ভবন* নামে চিহ্নিত হয়– তারপর তো ইতিহাস।

শতবর্ষোত্তর সমীৰায় এসে বিস্মিত হতে হয় প্রতিভা বসুর আধুনিক মনন ও মানসিকতায়। সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি পাবার অনেক আগে থেকেই তিনি ঢাকা শহরে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যে পরিচিত ছিলেন। রাণু সোম নামের সেই স্বর্ণকণ্ঠী কিশোরী তখন মুসলমান ওস্তাদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন, নজরুলের কাছে গান শিখেছেন এবং সাহিত্যচর্চার কুঁড়ি তখনই ফুল হয়ে ফুটতে শুরু করেছে তাঁর মনে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহের পর চল্লিশের দশক থেকে তাঁর লেখালেখির শুরু এবং কালক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় লেখকরূপে পাঠকসমাজে সমাদৃত। তাঁর ভাষার যাদুকরী মায়া, প্রেমের মাধুরীছড়া নো অনবদ্য সংলাপ, গভীর গোপন ভালবাসার ঐকান্তিক আবেগ তাঁর গল্পউপন ্যাসে এনেছে স্বাদু রম্যতা।

তাঁর গল্প বলার যাদুকরী ক্ষমতার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে তিনি পাঠককে অভিভূত করেন। বৌদ্ধিক উন্নাসিকতায় তাঁর লেখাকে মেয়েলি আবেগের উৎসার বলার আগে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়, লেখার মধ্যে তাঁর সাহসী সত্তার প্রকাশে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পসংকলনের ভূমিকায় সংকলক দময়ন্তী বসু সিংএর সার্থ ক মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে–

'ঝরঝরে আধুনিক ভাষা, স্মার্ট ডায়ালগ, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং প্রেমের গল্পের খোলসে যে ভাবে তিনি গুঁজে দেন তখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত 'ফেমিনিস্ট' দৃষ্টিভঙ্গি তা তুলনারহিত। সেই চল্লিশের দশকে যে ভাবে প্রতিভা বসু হিন্দুমুসলমা নের প্রেম ও বিবাহের সপক্ষে সওয়াল করেছেন তা মহিলা কেন, কোনও পুরুষ লেখকের গল্পেও পাই না।'

এ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বে তাঁর অনবদ্য গল্প 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' ও অনন্য উপন্যাস *সমুদ্রহৃদয়*এর কথা।

আমাদের কিশোরীবেলা থেকে মুগ্ধতার আবেশে পড়েছি তাঁর গল্প আর মনোহরণকারী উপন্যাসগুলি– *মনের ময়ূর, মেঘের পরে মেঘ, সেতুবন্ধ, অতল জলের আহ্বান, মনোলীনা, অতলান্ত, অপেক্ষাগৃহ, সোনালি বিকেল, সকালের সুর সায়াহ্নে, আলো আমার আলো, রাঙা রাঙা চাঁদ, অগ্নি তুষার, সমুদ্রহৃদয়*– তালিকা দীর্ঘ।

কথা সাহিত্যের দুটি শাখা– উপন্যাস ও ছোটগল্প। এই দুই ধারাতেই প্রতিভা বসুর লেখনী সমান স্বচ্ছন্দ। ঐন্দ্রজালিকের মত সম্মোহনী সংলাপের মাধুর্যে, প্রেমের সুগভীর অনুভবের ঐশ্বর্যে তাঁর রচনা এক অনুপম উপহার।

আগেই বলা হয়েছে, তাঁর রচনার ধ্রুবপদ– প্রেম। প্রেমপথে সব বাধা ভাঙার প্রত্যয়ী প্রয়াসে তাঁর কাহিনির চরিত্ররা জীবনপথ পরিক্রমা করেছে। বেদনার মধ্য দিয়ে মিলনের তীর্থে উত্তরণের কাহিনি তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে দেখেছি। অন্যদিকে কয়েকটি ছোটগল্পে বিরহের তীব্র বেদনা লগ্নিত। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা প্রয়োগ করে বলতে পারি– 'সে মিলন অনবদ্য, এ বিরহ অনির্বচনীয়'।

প্রতিভা বসু মনোধর্মে রোমান্টিক, কিন্তু তাঁর কাহিনি বাস্তবের ভূমিতে রচিত। বিচিত্র রসে অভিষিক্ত তাঁর ছোটগল্প। তাঁর গল্প সংকলনে দৃষ্টি দিলে এই বিচিত্রমুখিনতার পরিচয় মিলবে। এ প্রসঙ্গে অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'বিচিত্র হৃদয়'এর কথা ম নে আসে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আশ্চর্য এই গল্পে বিধবা মায়ের প্রেমিকের প্রতি কিশোরী কন্যার সুতীব্র কামনার দহন ও দাহ প্রকাশিত। পাশাপাশি অকাল প্রয়াত বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি সেই মানুষটির সুগভীর প্রেমও চিত্রিত। বিচিত্র রসের এমন বেদনাকরুণ কাহিনি সাহিত্যে কমই আছে। ভুলতে পারা যায় না 'সুমিত্রার অপমৃত্যু'র মত অসামান ্য গল্পটি– ভালবাসা যেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঊর্ধ্বে উড়িয়েছে প্রেমের অবিনাশী নিশান। আবার সত্তরের দশকের সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় ভারী হয়ে যাওয়া পরিবেশে এক আশ্চর্য প্রেমের সম্পর্ক এঁকেছেন প্রতিভা বসু, যেখানে ভালবাসা ও ঘৃণা বিষামৃতের মত তীব্র। 'অন্ধকারে' গল্পটিতে দিগভ্রান্ত ধ্বংসকারী নায়কের প্রতি নায়িকার অপ্রতিরোধ্য অন্ধ আকুল প্রেমের আত্মবিনাশী প্রকাশ।

'গুণীজনোচিত' গল্পে এক নারীর অতৃপ্ত অশরীরী আত্মার বেদনাকরুণ কাহিনি পাঠকের মনে আনে রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পটির স্মৃতিলেখা।

বিদেশের পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলিতে আছে অচেনা মাধুরীর প্রকাশ। 'অর্কেস্ট্রা', 'প্রথমা', 'ক্রিস্টিনা ফ্রীডম্যান', 'মাৎসুমোতো' গল্পগুলিতে দেখেছি দেশকালের সীমানা ছাড়ানো আবেগাকুল প্রণয়ের অনিঃশেষ মাধুরী। আমেরিকান তরুণ ও বাঙালি তরুণীর হৃদয় বিনিময়ের আশ্চর্য গভীর এই ভালবাসা মূর্ত তাঁর *অগ্নি তুষার* উপন্যাসে।

তাঁর প্রথম গল্প 'মাধবীর জন্য' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেন। তার পর থেকে প্রতিভা বসুকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর বিচিত্র রসের নানাধরনের গল্প আর হৃদয়রসসিঞ্চিত উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করলেন এক রোম্যান্টিক

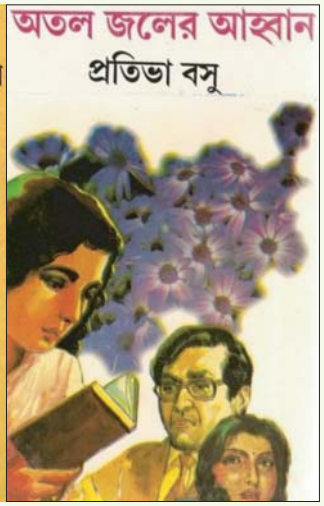

পরিমণ্ডল। যৌবনউ ন্মেষলগ্নের তরুণী পাঠিকা যেন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল সেদিন। কবির ভাষায় 'যে ছিল ঝিরঝিরে নদী সে যেন হঠাৎ শুনতে পেল সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান'। প্রতিভা বসু তাঁর পাঠকক্ষ পাঠিকাকে ভালবাসতে শেখালেন; শোনালেন সেই বাঁশিওয়ালার মোহন বাঁশি যার ডাকে ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে বেরিয়ে এল প্রেমের পথে, বলতে লাগল আপন অন্তরকে– 'প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও'। তাই সদ্যতরুণী সুমিত্রা সমাজের বাধ্যানি ষেধ রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে জীবনে বরণ করে নিল ইউসুফকে; প্রেমের শক্তিতে দীপ্তিময়ী মেয়েটি যেন অনুচ্চারিত সংলাপে বলেছে– 'আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী'। এই বাঁধন ছেঁড়ার শাস্তিও তাকে পেতে হয়েছে– তাই ইউসুফকে হারিয়ে সে হারিয়েছে মানসিক ভারসাম্য। অনন্ত প্রেমের এমন বেদনাকরুণ ট্র্যাজেডি লেখকের সংবেদনশীল লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে; আমরা সুমিত্রার বয়সী সেদিনের পাঠিকারা তার জন্য চোখের জলে ভেসেছি।

দেশভাগের সাহিত্যে বহু লেখকের অনবদ্য রচনা পেয়েছি। তাঁদের পাশাপাশি একটি অনন্য প্রেমকাহিনি রচিত হয়েছে প্রতিভা বসুর মরমী কলমে। *সমুদ্রহৃদয়* উপন্যাসের অভিজাত প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী নায়ক সুলতান আহমেদ তার অনিঃশেষ অনন্ত ভালবাসার চিরন্তন প্রেমপ্রতীক হয়ে বাংলা রোম্যান্টিক আখ্যানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নায়িকা সুলেখার ঘৃণার বিষ কখন যে প্রেমের মধুরিমায় অমৃত হয়ে উঠেছে, তা সে নিজেও বোঝেনি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি তরুণ হৃদয়ের নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে *সমুদ্রহৃদয়* তার শীর্ষনামকে সার্থক করেছে।

আবার তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস *মনের ময়ূর*এ লেখিকা চিরস্মৃত প্রেমের যে অতলান্ত গভীর অনুভবকে রূপায়িত করেছেন– তাও অনবদ্য। লেখক প্রতিভা বসু কেবল নারী হৃদয়ের বাসনা বেদনার কথাই বলেননি, পুরুষ চরিত্রের অনিঃশেষ প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। *মনের ময়ূর*এর বিনয়, *সমুদ্রহৃদয়*এর সুলতান কিংবা *অগ্নি তুষার*এর আ মেরিকান নায়ক রাসেল– সকলেই প্রেমের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। সকল কাঁটা ধন্য করে তাদের ভালবাসা তাই একদিন ফুল হয়ে ফুটেছে।

প্রতিভা বসুর প্রেমসুধারসে সিঞ্চিত গল্প উপন্যাসের মুগ্ধ পাঠক নতুন করে অভিভূত বিস্মিত হয়েছে তাঁর শেষ জীবনের অসামান্য গবেষণাঋদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ– *মহাভারতের মহারণ্যে* পাঠ করে। মহাভারতের প্রচলিত মহিমাকে যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারতের কথা*র পর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে বিচার করেছেন প্রতিভা বসু, বিশ্লেষণ করেছেন ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে, খণ্ডন করেছেন যুগসঞ্চিত মহাভারতীয় ধর্ম মহিমাকে। তাঁর মতের সঙ্গে অনেকেই সহমত না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও ব্যাখ্যার স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত। *মহাভারত* যে আসলে অনার্য নারী সত্যবতীর বংশানুক্রমিক ইতিহাস, আর্যরক্তের গরিমার পাশে অনার্যরক্তের প্রতিষ্ঠার কাহিনি– এই ব্যতিক্রমী বিস্ফোরক যুক্তিতে তিনি নতুনতর ব্যাখ্যায় *মহাভারত*কে যেন নতুনভাবে সৃজন করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ না বলে কৃষ্ণসহায় পা-বদের কপটতার জয় বলে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর এই আধুনিক ফেমিনিস্ট দৃষ্টিতে *মহাভারত*এর বিচার বিতর্ক তুলতেই পারে। কিন্তু আশি বছর অতিক্রান্ত রোগশয্যায় শায়িতা এক লেখকের মনের আশ্চর্য সজীবতাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। যিনি রোম্যান্টিক প্রেমের নিপুণ শিল্পী, তিনিই ক্ল্যাসিক সাহিত্যকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নতুনতর ব্যাখ্যায় উজ্জীবিত করলেন। রোম্যান্টিসিজম ও ক্ল্যাসিসিজমের সমন্বয়ে প্রতিভা বসু তাই এক অনন্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব যিনি বাঙালি পাঠকসমাজকে অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে আবিষ্ট করে রেখেছেন।

তবে তাঁর রচনার ধ্রুবপদ– প্রেম। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন– 'আজীবন শুধু একটি কবিতা লিখেছি সে কবিতা ভালবাসার কবিতা'। তাঁর সহধর্মিণী প্রতিভা বসুও সারাজীবন সাহিত্যে প্রেমের প্রতিমা গড়েছেন। প্রেমের উন্মেষ, প্রেমের আনন্দ, প্রেমের বেদনা, প্রেমের শিহরন, প্রেমের যন্ত্রণা, প্রেমের প্রত্যাশা, প্রেমের প্রত্যাখ্যান, প্রেমের অভিমান, প্রেমের অনুভব, প্রেমের সমর্পণ, প্রেমের স্মৃতিমন্থন বিচিত্র তরঙ্গবিভঙ্গে তাঁর লেখনীতে প্রকাশিত। মনের গভীরে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠা প্রেমের দিব্য মহিমা ও গরিমাকে আন্তরিক সংলাপে মূর্ত করে প্রতিভা বসু অপরিশোধনীয় ঋণে আমাদের জড়িয়েছেন।

জন্মশতবর্ষে তাঁকে আমাদের বিনম্র প্রণতি।

মীনাক্ষী সিংহ ভারতের শিক্ষাবিদ, কথাশিল্পী

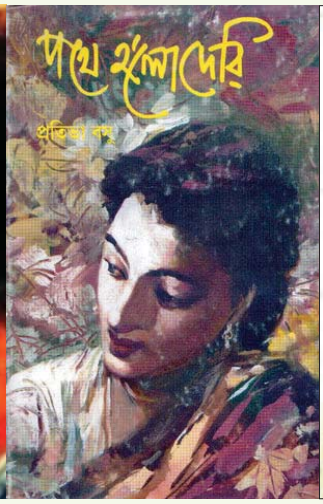

নিবন্ধ

সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ড. নিশীথকুমার পাল

উত্তর প্রদেশের রুড়কিতে অবস্থিত সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিবিআরআই) ষাট বছর ধরে ভারতের নির্মাণ শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সিমেন্ট, স্টিল ও অর্থের সাশ্রয় ছাড়াও স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রীর সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের মধ্যে আছে পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইউড, বিমানের আসনের কুশন ইত্যাদির জন্য অগ্নি প্রতিরোধক ট্রিটমেন্ট, গ্রামীণ এলাকার গৃহ নির্মাণের ডিজাইন, পাহাড়ী এলাকার জন্য নির্মাণ পদ্ধতি, দেশব্যাপী নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য ডিজাইন ও প্ল্যানিং, মথুরা রিফাইনারি কমপ্লেক্সের আবাসন ও শহর প্ল্যানিং, ক্লে ফ্ল্যাইঅ্যাশ এবং স্যান্ড লাইম ইট তৈরির প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব উঁইপোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, থিয়েটার, সিনেমা হল এবং অডিটোরিয়ামের আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবনে কৃষি বর্জ্যের ব্যবহার এবং আরো অনেক কিছু।

প্রারম্ভ

কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর)এর অধীন স্থ একটি বিল্ডিং রিসার্চ ইউনিট হিসেবে তদানীন্তন টমাসন কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পরবর্তীকালে নাম হয় ইউনিভার্সিটি অফ রুড়কি এবং বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)এর দুটি ক ৰে অত্যন্ত সাধারণভাবে শুরু হয় সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পথ চলা ১৯৪৭ সালে। টমাসন কলেজ ছিল ভারতের প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। স্বাধীনতার পর বিল্ডিং রিসার্চ ইউনিটের কার্যপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ সালে একে ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৫১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহাংর উপস্থিতিতে ন্যাচারাল রিসোর্সেস এন্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলের ওপর চাপ কমানোর জন্য এখানকার বিজ্ঞানীরা কাঠের বিকল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। জৈব বস্তু, যেমন সিজনড্ ও ট্রিটমেন্ট দেওয়া রাবার, কাগজ কলের সেলুলোজিক বর্জ্য, প্রসারিত পলিস্টাইরিন, রেড মাড পলিস্টার, প্রাকৃতিক তন্তু এবং রজন ম্যাট্রিসেস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকারের স্যান্ডউইচ কম্পোজিট উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা দরজার সাটার, ফাইবার সিলিং, পার্টিশান এবং তাপীয় ও শব্দ ইনসুলেশনে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এ প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

অর্জনসমূহ

কম খরচে গৃহনির্মাণ: গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই কম খরচে গৃহ নির্মাণের বিষয়টি এই ইনস্টিটিউটের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ৰেত্র। কম খরচে ছাদ, প্যানেল, দেয়াল, মেঝে এবং গৃহের অন্যান্য উপাদান তৈরির কৌশল এই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করে থাকেন।

অসুবিধাজনক ভূমিখ- গৃহনির্মাণ: পাহাড়ী, বন্যাপ্রবণ এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় গৃহনির্মাণের ডিজাইন উদ্ভাবনে সিবিআরআইএর বি জ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও কেরালার উপকূলীয় এলাকায় পিরামিডের মত ছাদ ব্যবহার করে গৃহনির্মাণের বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। পরীৰার ফলাফলে দেখা গেছে যে, এই ছাদের ওপর ঘূর্ণিঝড়ের কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি।

গৃহনির্মাণ সামগ্রী: এই ইনস্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বিভিন্ন প্রকারের গৃহনির্মাণ সামগ্রী তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কাঠের বিকল্প, পলিমার, প্লাস্টিক, রক্ষাকারী আবরণ, অ্যাড্হেসিভ, সিমেন্ট, চুন, চুনভিত্তিক দ্রব্য, সুপার প্লাস্টিসাইজার এবং উচ্চ ৰমতাসম্পন্ন কংক্রিট তৈরির গবেষণা চলছে। এই ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাভল, ভদোদরা (গুজরাট), রোপার ও ভাটিন্ডা (পঞ্জাব) এবং দিল্লিতে ক্লেফ্ল্যাইঅ্যাশ ইট তৈরির কয়েকটি প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। এ সব প্লান্টে ইট তৈরির জন্য ৪৯৫০% স্থানীয়ভাবে লভ্য ফ্ল্যাইঅ্যাশ ব্যবহৃত হয়। এই ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তি ও প্রায়োগিক তত্ত্বাবধানের ওপর ভিত্তি করে কলকাতার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দুর্গাপুরে ফ্ল্যাইঅ্যাশলাই মের ইট তৈরির একটি বাণিজ্যিক প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এই প্ল্যান্টে প্রতিদিন ৪০হাজার ইট তৈরির ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রথাগত গৃহনির্মাণ সামগ্রীর উন্নতিকল্পেও সিবিআরআইএর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। এর মধ্যে আছে ক্ষয় হয় না এমন প্ল্যাস্টার, ক্লে রুফিং টাইলস ও পাইপ, মাটির দেয়ালের জন্য ফেরো সিমেন্ট প্লাস্টার, নিম্নমানের মাটি থেকে পোড়া ইট তৈরি, কম জ্বালানি ব্যবহার করে ভাল মানের চুন এবং উন্নতমানের ক্যালসিনেটরের মাধ্যমে উন্নতমানের জিপসাম উৎপাদন।

দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলের ওপর চাপ কমানোর জন্য এখানকার বিজ্ঞানীরা কাঠের বিকল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। জৈব বস্তু, যেমন সিজনড্ ও ট্রিটমেন্ট দেওয়া রাবার, কাগজ কলের সেলুলোজিক বর্জ্য, প্রসারিত পলিস্টাইরিন, রেড মাড পলিস্টার, প্রাকৃতিক তন্তু এবং রজন ম্যাট্রিসেস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকারের স্যান্ডউইচ কম্পোজিট উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা দরজার সাটার, ফাইবার সিলিং, পার্টিশান এবং তাপীয় ও শব্দ ইনসুলেশনে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এ প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

শক্ত পিভিসি ফোম শিট ও বোর্ড তৈরির একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যা প্যানেলিং, সারফেসিং, পার্টিশান, নকল সিলিং, এমন কি আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এই ইনস্টিটিউট একটি আস্তরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা কংক্রিটে স্টিলের দ-কে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। মেঝে ও দেয়ালের জন্য পলিমার রূপান্তরিত সিমেন্টাস টাইলস এবং রাসায়নিক প্রতিরোধী টাইলস উদ্ভাবিত হয়েছে। পলিমেরিক কম্পোজিট সামগ্রী ব্যবহার করে অতিশয় মজবুত পলিটাইলস তৈরি করা হয়েছে। শিল্প কারখানার ভবনসমূহে যেখানে অ্যাসিড ও ক্ষার নিয়ে কাজ করা হয়, সেখানে এই টাইলস খুব উপযোগী। খুব শক্ত হওয়ায় এই টাইলস ব্রিজের ডেক, সিনেমা হল, স্টেশনের প্লাটফর্ম ইত্যাদি স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিল্ডিং দক্ষতা: সিবিআরআইএর বি জ্ঞানীরা আবাসন ও শিল্প কারখানার ভবনগুলিতে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আলো, বায়ু চলাচল, শব্দ ও তাপজনিত স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যেও গবেষণা করে চলেছেন। উঁচু ভবনগুলোতে পার্শ্ববর্তী ভবনের প্রভাবে বায়ুচাপের বিস্তার সম্পর্কে জানার জন্যও গবেষণা চলছে।

বিল্ডিং প্রক্রিয়াকরণ: বিল্ডিং তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ নির্ণয়, নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত মেশিন এবং বিল্ডিং প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনা বিষয়েও গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। কম মূল্যে মেঝে ও ছাদ তৈরির লক্ষ্যেও গবেষণা হয়েছে। ফ্ল্যাইঅ্যাশ, কুইক লাইম, সিমেন্ট এবং একটি ফোমিং এজেন্ট দিয়ে হাল্কা সেলুলার কংক্রিট ফিলার ব্লক তৈরি করা হয়েছে, যা মেঝে ও ছাদে ব্যবহৃত হয়। সেলুলার কংক্রিট ব্লকের সুবিধা হল, প্রথাগত স্ল্যাবের তুলনায় এর তাপীয় পরিবাহকতা কম, ভাল অগ্নিনিরোধক, ওজনে হাল্কা, সিমেন্ট ও স্টিল সাশ্রয়ী এবং বিল্ডিং তৈরির কম খরচ। এই ইনস্টিটিউট একটি মিনি ক্লাইম্বিং ক্রেন উদ্ভাবন করেছে, যা ১৯৯৪ সালে নতুন দিল্লির ন্যাশনাল রিসার্চ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের 'ন্যাশনাল ডে' পুরস্কার লাভ করেছে। এটি ১০০০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে। বহুতল ভবন তৈরিতে এই ক্রেন সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বিল্ডিং ডিজাইন: বিল্ডিং ডিজাইন ও তৈরিতে সিবিআরআই একটি অথরিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিল্ডিংয়ের উপযুক্ত ওরিয়েন্টেশন, তাপীয় ইনসুলেশন, জানালার অবস্থান, শব্দ হ্রাসকরণ এবং শক্তি সাশ্রয়ের মাধ্যমে বিল্ডিংয়ে একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরিসহ দক্ষ বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে সিবিআরআই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছে। এখানকার গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে আছে পৃষ্ঠ বাষ্পীভবনের দ্বারা ছাদ শীতলীকরণ, বিল্ডিংয়ের শক্তি সংরক্ষণ, পার্টিশনের মাধ্যমে শব্দ হ্রাসকরণ, আলো ও বায়ু চলাচলের দক্ষতা এবং অভ্যন্তরীণ বায়ু চলাচল বৃদ্ধি। সারা দেশের জন্য ক্লাইমেটোলজিক্যাল, মিটিওরোলজিক্যাল ও সৌরউপা ত্তসংবলিত একটি ব্যাপক থার্মাল কমফোর্ট অ্যাটলাস বা তাপীয় স্বাচ্ছন্দ্য মানচিত্র এই ইনস্টিটিউট প্রস্তুত করেছে। বিল্ডিংয়ের অবস্থান ও ওরিয়েন্টেশন নির্ধারণে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের জন্য এই মানচিত্র খুবই উপযোগী।

এই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। যেমন দিনের আলোর লভ্যতা মূল্যায়ন ও সূর্যালোকের প্রবেশ্যতা নির্ণয় যন্ত্র এবং গৃহস্থলীতে ব্যবহারের জন্য সোলার ওয়াটার হিটার। এছাড়াও, এর বিজ্ঞানীরা বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের জন্য বিশেষধরনের সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছেন যা ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় (যেমন গুজরাটের ভুজ) গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্সি প্রজেক্টেও সিবিআরআই অবদান রেখেছে। সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন প্রজেক্ট হল নবোদয় বিদ্যালয় প্রজেক্ট। গ্রামীণ এলাকার মেধাবী শিশুদের জন্য ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে উচ্চ মানসম্পন্ন মডেল বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করে। সারা দেশে নবোদয় বিদ্যালয় কমপ্লেক্স তৈরির প্ল্যান ও ডিজাইন করার জন্য সিবিআরআই কে বেছে নেওয়া হয়। সিবিআরআইএর ডিজাইন ও নির্মাণ প্রযুক্তি অনুসারে এখন পর্যন্ত ৩৫০টি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। অনেক উঁচু স্থানে, যেমন কার্গিল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর, যেমন লাক্ষা দ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এই কমপেস্নক্স তৈরি করা হয়েছে।

বিল্ডিংয়ের ভিত: পরিত্যক্ত এলাকার গভীরে নরম মাটিসংবলিত স্তরে বিল্ডিংয়ের ভিত নির্মাণের জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্ক্রু পাইল তৈরি এক বিরাট অগ্রগতি। এৰেত্রে স্প্রাইসড় পাইল প্রযুক্তিও খুব কার্যকর। প্রথাগত পদ্ধতির তুলনায় এ প্রযুক্তি দ্রুত, ব্যয়সাশ্রয়ী ও দৰ।

দূষণমুক্ত ভাটা: দূষণমুক্ত ইট ও চুন তৈরির লক্ষ্যে সিবিআরআইএর বিজ্ঞানীরা কঠোর পরিশ্রম করছেন। গ্রাম ও আধাশহর এলাকায় ইট ভাটা বায়ুদূষণের বড় উৎস। এখানকার বিজ্ঞানীরা একটি সরল, খরচ সাশ্রয়ী ও দক্ষ গ্রাভিটেশনাল স্টেলিং চেম্বার তৈরি করেছেন, যা ইট ভাটা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক ধোঁয়া থেকে কণাকার বস্তু অপসারণ করে। অনেক ইটভাটার মালিক এই প্রযুক্তি গ্রহণ করেছেন।

দুর্যোগ মোকাবেলা: দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও এই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অগ্নিকাণ্ডের সমস্যা, ভূমিধস নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্গত এলাকায় স্বল্পমূল্যে ও অতিদ্রুত গৃহনির্মাণের লক্ষ্যে এখানকার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। ভূমিকম্প, অগ্নিকা-, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হল গৃহহীনদের জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। এসব ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সিবিআরআই তাৎক্ষণিকভাবে গৃহনির্মাণের ডিজাইন উদ্ভাবন করেছে। এসব গৃহ পনের মিনিটের মধ্যে তৈরি ও ভেঙে ফেলা যায়। অগ্নিকা-প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ ও নির্বাপণের বিভিন্ন দিক নিয়েও এখানে গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে তাঁবু ব্যবহার করা হয়, তা আগুন প্রতিরোধী করার জন্য সূতিবস্ত্রকে কিছু সময় ধরে রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট করা হয়। এসব বস্ত্র দহনের সময় কোন ৰতিকারক গ্যাস নির্গত হয় না। ভূমিধস পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানকার বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। হিমালয় এলাকায় ভূমিধস একটি সাধারণ ঘটনা। গাড়োয়াল ও সিকিমের প্রধান প্রধান ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক ও ভূকারিগরি জরিপ ক রেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা।

উইপোকা নিয়ন্ত্রণ: উইপোকা নিয়ন্ত্রণে সিবিআরআইএর বি জ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বনাঞ্চলের পচা কাঠ ও পাতা বিয়োজিত করে জৈব সার তৈরিতে উইপোকার অবদান আছে। তবে এরা আবার ভবনের যথেষ্ট ৰতি করে। উই সেলুলোজ জাতীয় সকল বস্তুই খেয়ে ফেলে এবং ইটের জোড়ার ভিতর দিয়ে এবং জল ও বিদ্যুতের পাইপের পাশ দিয়ে চলাচল করে– ভবনের কাঠের তৈরি সামগ্রীর ক্ষতি করে। ১৯৯৬ সালে সিবিআরআই একটি বিল্ডিং পেস্ট ও মাইকোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছে। এর কাজ হল মৃত্তিকা পরিশোধনে ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব, কাঠের প্রিজারভেটর হিসেবে পরিবেশবান্ধব কীটনাশকের দক্ষতার মূল্যায়ন এবং উদ্ভিজ্জ এবং অবিষাক্ত উঁইপোকা বিতাড়নৰম আস্তরণ তৈরি ও ভৌত বাধা সৃষ্টি করা। ভবনে বসবাসরত ইঁদুর, তেলাপোকা, মশা এবং ছত্রাক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও এখানে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের সুরক্ষা: আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাজমহলের সুরক্ষার দায়িত্ব সিবিআরআইএর ওপর ন্যস্ত করেছে। এ লক্ষ্যে, যে মাটির ওপর এটি অবস্থিত তার প্রকৃতি, এর ভিতের শক্তি, এটি যে পাথর দিয়ে তৈরি তার স্থায়িত্ব এবং এর ওপর বিচূর্ণীভবন এবং আগ্রার চারপাশের কলকারখানা থেকে নির্গত পরিবেশ দূষকের প্রভাব নিয়েও গবেষণা হয়েছে। সিবিআরআই পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের নবরূপায়ণে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের ডাটাবেসও এ ইনস্টিটিউট তৈরি করেছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সিবিআরআইএর গ বেষণার প্রায়োগিক দিক ভবিষ্যতে নির্মাণশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রফেসর নিশীথকুমার পাল শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ জু লা ই

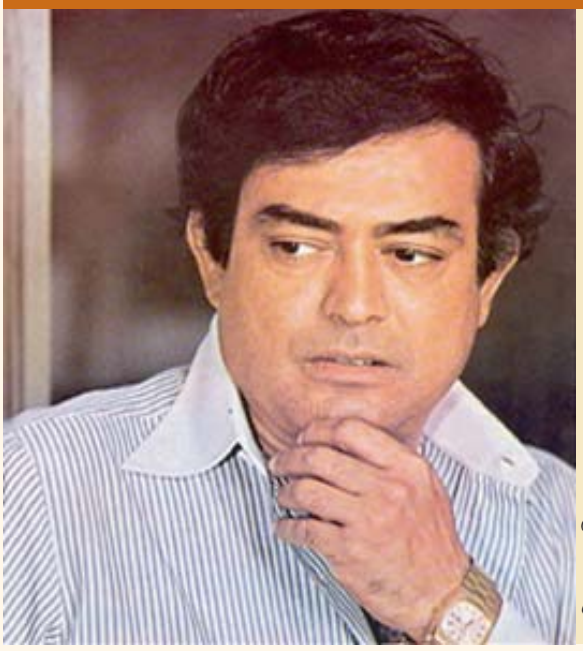

অভিনেতা সঞ্জীবকুমার

০১ জুলাই ১৮৮২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২	❖	স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু
০৭ জুলাই ১৯০৫	❖	প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪	❖	রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩	❖	কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮	❖	অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম
১৮ জুলাই ১৯০৯	❖	কবি বিষ্ণু দের জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৯৯	❖	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)এর জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৬৩	❖	কবিগীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২	❖	কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪	❖	প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩	❖	গায়ক মুকেশের জন্ম
২৪ জুলাই ১৯৮০	❖	উত্তমকুমারের মৃত্যু
২৬ জুলাই ১৮৬৫	❖	রজনীকান্ত সেনের জন্ম
৩১ জুলাই ১৮৮০	❖	মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

ছোটগল্প

মহিমের জোড়াবলদ

মাহবুব রেজা

গঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মরা খালের কাছে এসে দাঁড়ায় সে। অনেকৰণ হল ছাইরঙা সন্ধে উতরে অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকার এখনো তেমন জমাট হয়নি। তবে অন্ধকারটা জমাট বাঁধব-বাঁধব করছে। কচুরিপানা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অন্ধকারের ভেতর কচুরিপানাগুলোকে অধিকতর অন্ধকার বলে ভ্রম হয়। কচুরিপানার পাশে বাঁধা লতা-পাতা দিয়ে জাংলার মত বানিয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হতে পারে বুঝি মাছ ধরার জাল পাতা আছে। পানি টান লাগার সময় বাঁশ, লতাপাতার নিচে অজস্র মাছ ভিড় করে।

মরা খালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে একটু জিরোয়। হাটবার বলে দ্রুত পা চালানোর ফলে সে ক্লান্ত। শরীর বেঁকে আসছে। গোড়ালির নিচ থেকে চিনচিনে এক ধরনের ব্যথা মেয়েলোকের কান্নার মত বেরিয়ে কোমর অব্দি চলে আসতে চাইছে। মহিম নিজের বলদজোড়া নিয়ে এসেছিল হাটে। উদ্দেশ্য বিক্রি। বলদজোড়া বিক্রি করব বিক্রি করব বলে বলে মহিম প্রায় বছরখানেক ধরে রেখেছিল। এই সময়টুকু সে হাতে নিয়েছিল এই ভেবে যে, এর মধ্যে যেভাবেই হোক অন্য কোথাও থেকে সে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলবে। টাকার ব্যবস্থা করার জন্য মহিম কম কসরত করেনি।

মহিম তার এই মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেশ চিন্তার মধ্যে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ আসেই না। চোদ্দ মাসের মাথায় বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে মেয়েটার দু'গ্রাম পর থেকে। ছেলেটা বোকা কিসিমের। বাপের টুকটাক জমি-জিরেত আছে। আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে যেন সেই বউ চলে গেছে। বউ চলে যাওয়া নিয়ে গ্রামের লোকজন নানা ধরনের কথা বলে। সেসব কথা শুনলে ছেলেটারই যে দোষ বেশি তা বোঝা যায়। ছোট মেয়ে সরস্বতী অবশ্য মহিমকে বিয়ের খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। একই গ্রামের নখাকে নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে ভেগে গেছে।

কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। মহিম অতগুলো টাকা একসঙ্গে যোগাড় করতে পারেনি। একসঙ্গে কে-ই বা আর মহিমকে অত টাকা দেয়! না হয় টাকাগুলো কেউ একসঙ্গে কোনমতে মহিমকে দিলই-বা তারপর ধার নেওয়া টাকাগুলো মহিম যদি ঠিক সময়ের মধ্যে ফেরত না দিতে পারে? এসব ছোটলোক গরিবগুর্বোদের টাকা ধার দিয়ে কখনো একসঙ্গে পুরোটা পাওয়া যায় না।

মহিম এরকম বিপদের মধ্যে বড় ভাই মঙ্গাকে টাকার কথা বলেছিল। মহিমের মেয়ের বিয়েতে টাকার দরকার। মহিমের বড় মেয়ে। দেখতে বেজায় কালো। অন্ধকার রাতে মহিমের মেয়েটা হাসলে শুধু তার দাঁতগুলো ফকফক করে জ্বলে ওঠে। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশের ভেতরে ঢুকে পড়া বড় বড় ভারতীয় গরুর মত মেয়েটার গড়ন। মহিম তার এই মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেশ চিন্তার মধ্যে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ আসেই না। চোদ্দ মাসের মাথায় মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে দু'গ্রাম পর থেকে। ছেলেটা বোকা কিসিমের। বাপের টুকটাক জমি-জিরেত আছে। আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে যেন সেই বউ চলে গেছে। বউ চলে যাওয়া নিয়ে গ্রামের লোকজন নানা ধরনের কথা বলে। সেসব কথা শুনলে ছেলেটারই যে দোষ বেশি তা বোঝা যায়। ছোট মেয়ে সরস্বতী অবশ্য মহিমকে বিয়ের খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। একই গ্রামের নখাকে নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে ভেগে গেছে। এ নিয়ে সালিশ হয়েছে। সালিশে নখার বড় ভাই অজয় মহিমকে দায়ী করে একহাত নিয়ে নিয়েছে আর গলা উঁচিয়েছে, ওই মহিম কুণ্ডুই ওর ছিনাল মেয়েটারে দিয়া আমার ভাইরে ভাগাইয়া নিয়া গেছে।

অজয়ের অশৈলী কথায় মহিম রেগে যায়। সেও নখার ওপর দোষ চাপায়, আমার মাইয়ার কী এমুন ঠ্যাকা পড়ছে যে তর ভাইরে ভাগাইব? মহিম অবশ্য অজয়ের মত মুখ খারাপ করে কথা বলেনি। শত হলেও মেয়ের জামাই তো! সালিশে কোন কূল-কিনারা হয় না। দুই পক্ষের অপরাধ সমান সমান। মহিম সালিশে চেহারায় একটা রাগ রাগ ভাব ফুটিয়ে রাখল। মেয়েটা তাকে খরচের হাত থেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে গ্রাম ছাড়ল। মুখে চুনকালি মেখে দিল। এসব কারণ উপলক্ষ্য করে মহিম স্বাভাবিকভাবে চেহারায় যতটা সম্ভব রাগ রাগ ভাব ঝুলিয়ে রাখল। তবে সে মনে মনে তৃপ্ত। মেয়েটা তাকে খরচ থেকে নিষ্কৃতি দিল! সালিশ শেষে মন খারাপ নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে বাড়ি ফিরল মহিম। রাতের আকাশে বিড়ির ধোঁয়া মহিমের স্বস্তির ধোঁয়া হয়ে উড়তে লাগল।

মহিম বড় ভাইকে টাকার কথা বলতেই মঙ্গা খেঁকিয়ে উঠল, আমার হাতে নাই টাকা-পয়সা আর তুই আইছস টাকা ধার লইতে? পারলে তুই আমারে কিছু টাকা দে।

মঙ্গার কথায় মহিম চমকে ওঠে, বলে কী! মহিম জানে মঙ্গা ওর বউয়ের কথামত চলে। ওঠবস করে। মঙ্গার বাজারে মুদির দোকান আছে। আয়-রোজগার ভালই। মঙ্গার কোন ছেলেপুলে নেই। মঙ্গার বউকে নিয়ে আশপাশের লোকজন আজেবাজে কথা বলে। মঙ্গার কানেও যায় সে-সব কথা। তাতে মঙ্গার কিছু যায়-আসে না। মানুষের কথা কানে তুললে কী নিজের আয়-উন্নতি হয়?

টাকাটা আমার খুব দরকার। থাকলে তুমি না কইরো না। কিছুদিন বাদে আমি টাকাগুলো দিয়া দিমু। মহিম বিশ্বাসী দৃষ্টি নিয়ে মঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তোরে দেওনের মত টাকা আমার কাছে নাই। আমার কাছে যে টাকা নাই বিশ্বাস না হয় তোর বউদিরে জিগা।

মহিম তার ভাইয়ের বউকে শুধু চেনে না, খুব ভাল করেই চেনে। আলমারিভর্তি টাকা থাকলেও কৃষ্ণা কখনো মহিমকে এক টাকাও দেবে না। আর অন্যের মেয়ের বিয়ের কথা শুনলে কে কাকে কবে টাকা দেয়?

মহিম মঙ্গার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দুই.

মহিম তার জোড়াবলদ নিয়ে যখন বাড়ি থেকে বের হল তখন সূর্য মাঝ আকাশে। যেন বা সূর্যমুখী ফুল। মহিমের কতকাল আগের পুরনো জং-ধরা টিনের চালে রোদ পড়ে খাঁ-খাঁ করছে। টিনের চালের ঠিক নিচে কবুতরের খোপ খোপ দেওয়া ঘরগুলো থেকে টানা গুনগুন শব্দ ওঠে। ঘরের চালে নেটের জালের ভেতর সুপারির দুটো পুঁটলি উল্টোমুখো হয়ে শরীরে রোদ লাগায়। ঠিক সেই সময় মহিম বলদজোড়া নিয়ে হাটের দিকে রওনা দেয়। মহিমের বউ কিছু না বলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। মার মত মার পাশে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটাও। মহিমের মেয়েটা হয়েছে অবিকল মায়ের মত।

মহিম উঠোন পেরিয়ে যায়। গরুদুটোকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আবার ফিরেও আসে। এসে বউকে বলল, কিছু কইবি? আনন লাগবনি কিছু? বলে মহিম চুপ মেরে থাকে। বাকী কথা তার গলায় ঝুলে থাকে। সবটা বেরোয় না।

মহিমের বউ ঘরের দরজা ছেড়ে নেমে আসে উঠোনে। চারদিক থেকে নিচু হয়ে এসে উঠোনের মাঝখানটা আপনা-আপনি কিছুটা উঁচু হয়ে গেছে। মাঝখানে উঁচু হয়ে যাওয়ায় সুবিধাই হয়েছে। বৃষ্টির পানি উঠোনের উঁচু জায়গায় বেশিৰণ থাকতে পারে না। গড়িয়ে নিচে নামে। পানি নিচে নেমে যাওয়ার পর উঠোনময় গুটিকয়েক রেখার ভাঁজ পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

মহিমের বউ চাপা গলায় বলল, বলদজোড়া বিশ হাজারের নিচে বেচবা না। দাম না পাইলে বেচনের দরকার নাই। গরু বেচনের পর টাকা সাবধানে রাইখো। বলে মহিমের বউ এতৰণের জমাট বাঁধা কান্না আর আটকে রাখতে পারল না। হু হু করে কাঁদতে লাগল। মহিম কিছু বলল না। বলতে পারল না। বউয়ের কান্নাকে এখন প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

মহিম বউকে ধমক দিল, যাইতাছি গরু বেচতে আর তুই শুরু করছস প্যানদানি– বলে বউকে আরো একটা জোরে ধমক লাগাল মহিম, ওই কালী তোর মারে ঘরের ভিত্তে লয়া যা–

মহিম খুঁটির সঙ্গে বাঁধা বলদের রশি ভাল করে পরখ করল। তারপর ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। মেয়েকে জল আনতে বলে মহিম ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলল। মাথার ওপর চইত মাসের প্রখর সূর্য। গরমে হাঁপাতে থাকে সে। গরুদুটোও তার মত হাঁপাচ্ছে। গরু আর মহিমের মধ্যে পার্থক্য হল এই, গরু দুটোর মুখ গড়িয়ে লালা পড়ছে। মহিমের পড়ছে না। গরু দুটোকে দেখতে দেখতে মহিমের খুব রাগ হল। তার ইচ্ছে করল, বলদজোড়াকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। আবার মনে মনে ভাবে, বলে দেবে সে যেন সরস্বতীর মত নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে নিজে করে নেয়। পরৰণেই তার মধ্যে শংকা হয়। দেখা দেয় প্রশ্ন, আচ্ছা, কালী কি ইচ্ছে করলে

সরস্বতীর মত নিজেই নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে! মনে হয় না। কালীটা যে খুব বোকা স্বভাবের। বোকা মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট এক জীবনে শেষ হয় না। সৃষ্টিকর্তা তাই বোকা মেয়েদের বারবার পৃথিবীতে পাঠান।

মহিম জল খেয়ে উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পেছনে পড়ে থাকে ঘর, চৈত্র মাসের তেজালো রোদ।

মহিম ডাক শুনে পিছিয়ে আসে। পাটের ব্যাপারী জাহাঙ্গীর হোসেন। যুদ্ধের সময় জাহাঙ্গীর ভারতে চলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে জাহাঙ্গীরের পাটের ব্যবসা। বড় বড় তিনটা নৌকা আছে। নৌকাগুলো সারাবছর পাট কেনার জন্য বিভিন্ন জেলায় যায়। সস্তায় পাট কেনে। বাড়িতে প্রচুর জমিজমা। বছরে দুই-তিন হাজার মণ ধান হয়। বাজারে জাহাঙ্গীরের নিজের ধান ভাঙানোর কল আছে। ঘরে দু-দুটো জোয়ান বউ। সবার ঘরই ছেলেমেয়েতে ভরপুর।

মহিম গরু নিয়ে হাটে ঢোকে। হাটে আসার সময় পথে অনেকেই তার গরু জোড়া দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, বেচবানি! কত অইলে গরু দুইটা বেচবা মিয়া?

বড় মেয়ের বিয়েতে যত খরচ হয় তত হলেই সে গরু দুটো বেচে দেবে।

বেচনের দাম কও মিয়া। আকতা-কুকতা কইয়ো না। ঠিক মতন দাম কও।

মহিমের বলদজোড়া যে দেখে তারই চোখে লেগে থাকে। সবার চোখে মহিমের গরুজোড়ার টান টান শরীর ভাসে। মসৃণ চামড়া। গরু দুটোর শরীরে তেলতেলে একটা ভাব ছড়িয়ে আছে। মহিমের বউ যে দাম বলে দিয়েছিল সে সেই দামই বলেছে। না, না, সেই দামের সঙ্গে মহিম বুদ্ধি করে আরো তিন হাজার যোগ করেছে। এই দামে পছন্দ হয় কেনো নাইলে আগে বাড়বার পারো। তেইশ হাজারের জায়গায় যদি দুই-এক হাজার কমেও যায় তাতে লাভটা একটু বেশি হল।

হাটের মুখে পাটের বেল নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে ব্যাপারীর লোকজনেরা। লোকজন দরদাম নিয়ে চেঁচামেচি করছে। গদিতে তেলামাথায় আরাম করে বসে থাকে একটা লোক। ডান হাতের তর্জনী চালান করে মুখের ভেতর। পানের দলার চূর্ণবিচূর্ণ অংশ এ মাড়ি থেকে ও মাড়িতে পাঠায়। তর্জনী চালানোর সময় মুখ বিকৃত হয়। আয়েশে সিগ্রেটে বড় করে টান দেয়। সিগারেটে টান দেয়ার ফলে গল গল করে সিগ্রেটের ধোঁয়া আকাশে অজানা দেশের মানচিত্র তৈরি করে।

পাটের দোকানগুলো অতিক্রম করে মহিম গরু নিয়ে বাজারে ঢোকে। পেছন থেকে কেউ একজন মহিমকে গলা উঁচু করে ডাক দেয়, ওই মহি হুইনা যা।

মহিম ডাক শুনে পিছিয়ে আসে। পাটের ব্যাপারী জাহাঙ্গীর হোসেন। যুদ্ধের সময় জাহাঙ্গীর ভারতে চলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে জাহাঙ্গীরের পাটের ব্যবসা। বড় বড় তিনটা নৌকা আছে। নৌকাগুলো সারাবছর পাট কেনার জন্য বিভিন্ন জেলায় যায়। সস্তায় পাট কেনে। বাড়িতে প্রচুর জমিজমা। বছরে দুই-তিন হাজার মণ ধান হয়। বাজারে জাহাঙ্গীরের নিজের ধান ভাঙানোর কল আছে। ঘরে দু-দুটো জোয়ান বউ। সবার ঘরই ছেলেমেয়েতে ভরপুর।

আমারে ডাকছেন?

মহিম গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের পেছন থেকে লিকলিকে কালো চেহারার বাবর মহিমকে ডাক দেয়। বাবরকে বাংলা সিনেমার জোকারদের মত লাগে দেখতে। সে বলল, ওই মহি, তর গরু দুইখান হুজুরের পছন্দ হইছে। দাম কত ক।

মহিম ব্যাপারীর দিকে তাকায়। অযথা কথা কাটাকাটি এড়ানোর জন্য সে একদাম বলে, তেইশ হাজার টাকা। মহিমের দাম শুনে জাহাঙ্গীর হোসেন শিরশিরে বাতাসে গাছপালা যেমন মৃদুমন্দ দুলে ওঠে সে রকম নড়েচড়ে ওঠে। হাসে। জাহাঙ্গীরের হাসি বাবরকে সংক্রমিত করে। বাবরের সঙ্গে থাকা দু-চারজনও মিনমিন করে হেসে ওঠে।

ব্যাটা, আজাইরা দাম কইছ না। কত অইলে বেচবি হেইডা ক।

আজাইরা দাম কই নাই। এক দামই কইছি। মহিম চুপ করে গরু দুটোকে দেখে।

বাবর জাহাঙ্গীরের কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে ফিসফাস করে। তারপর মহিমকে বলে, মিলঝিল কইরা বারো হাজার দেই। গরু দুইটা দিয়া দে–

মহিম জাহাঙ্গীরের কাছে গরু বিক্রি করে না। সে গরম্ন নিয়ে বাজারের ভেতর ঢুকে যায়। পেছন থেকে বাবরের গলা শোনা যায়, বারো হাজার টাকায় বিক্রি করলে গরু দুইটারে পাড়ের নৌকায় রাইখা যাইছ।

বাবরের কথায় মহিম কোন কথা বলে না। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। একদাম বিশ হাজার। এর নিচে সে গরু বিক্রি করবে না।

মহিমের আশপাশে আরো অনেক গরু-ছাগল। মহিষও আছে বেশ কয়েকটা। তবে বয়সের ভারে লালচে কালো রঙের মহিষগুলো বুড়িয়ে গেছে। পিঠের কুঁজে কচি ধানের চারার মত লোম। লোমের নিচে নরম কাদার মত দগদগে ঘা। বড় নীল ডুমোমাছি ভন ভন করে সেই ঘায়ে ওড়াউড়ি করছে।

মহিম অনেকৰণ ধরে বেঁটেমত একটা লোককে তার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখছে। লোকটাকে সে আগে কখনো দেখেনি। সেই লোকটা লুঙ্গির পেছনের দিকটা প্রায় পশ্চাৎদেশের কাছাকাছি উঠিয়ে ঘুরঘুর করছে। বেলা পড়ে আসছে। রোদের তেজ একটু একটু করে কমছে। মরা খাল থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আম-কাঁঠালের গন্ধের মত মহিমের নাকে এসে লাগছে আর চারদিক শীতল করে দিচ্ছে।

চা লাগব চা।

এগারো-বারো বছরের একটা ছেলে। হাতে বড় চায়ের ফ্লাস্ক। খয়েরি রঙের। ছেলেটা দু-তিনটে সস্তা কাচের গ্লাসে আওয়াজ তুলে যাচ্ছে। ওর ভাবটা এরকম কেউ চা চাইলে সে জায়গামত গরম চা নিয়ে আসবে। ছেলেটাকে দেখে মহিমের চা খেতে ইচ্ছে করে। সে ছেলেটাকে এক কাপ চা আনতে বলে। ছেলেটা কাপে টুংটাং আওয়াজ তুলে সামনে আসে। কিছু দূর থেকে আরেকজন দুই কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। ছেলেটি দ্রুত হাঁটে, আয় চা গরম। বেঁটেমত লোকটা আরেকজন লোক সঙ্গে নিয়ে মহিমের সামনে এসে দাঁড়াল। বাজার আস্তে আস্তে জমে উঠতে শুরু করেছে। লোকজনের কথাবার্তা বলার গমগম কানে বড় বিশ্রী ঠেকে।

লোক দুটোর হাব-ভাব দেখে মহিমের খদ্দের বলে ভ্রম হয়।

গরুজোড়া তো খুব ফাইন– বলে বেঁটে লোকটা তার সঙ্গের লোকটাকে গরু দেখায়।

মহিম লোক দুটোর ভাব-গতিক খেয়াল করে। তাদের চালচলন দেখে। মহিম দাম বললে তার দামের সঙ্গে খদ্দেরদের দাম মেলে না। দামে বনিবনা হলে সে চোখ বন্ধ করে গরুজোড়া বিক্রি করে দেবে। বিকেলের শেষভাগে আঠারো হাজার আটশো টাকা বলে খুব জোরাজুরি করেছিল লেবুতলার মতিন ডাক্তার। মতিন লোকটা খুব ত্যাঁদড় প্রকৃতির। কথা বলার সময় মোরগের ঝুঁটির মত তার গোঁফ নড়ে। ইচ্ছে করলে মতিন ডাক্তার কিছু টাকা বাড়িয়ে দিয়ে মহিমের কাছ থেকে গরুজোড়া কিনে নিতে পারতেন। মহিমের একবার ইচ্ছে হয়েছিল ওই টাকায় গরুজোড়া বিক্রি করে সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর অত টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে মহিমের ভয় লাগে। যদি পথেঘাটে কোন বিপদ ঘটে! আজকাল বলা তো যায় না কিছু।

আপনেরা কী সত্যই গরু কিনবেন? মহিম লোক দুটোকে

জিজ্ঞেস করে।

হ মিয়া গরু কিননের লাইগাই তো হাটে আইছি। কও দেহি জোড়া কত?

একদাম কমু না উল্টাসিধা দাম... মহিমকে আর বাকি কথা বলার সুযোগ দিল না লোকটা। তার আগে বলে উঠল, আন্দাকুন্দা দাম কইলে গরু বেচন যাইব? একদামই কও।

বেঁটেমত লোকটা সঙ্গের লোকটাকে কোন কথা বলতে দিচ্ছে না। বেঁটে লোকটার তুলনায় সঙ্গের লোকটাকে বেশ ভদ্র বলে মনে হল মহিমের। কিছু লাজুক প্রকৃতিরও মনে হল।

একদাম বিশ হাজারে গরুজোড়া লইতে পারেন।

বিশ হাজার! বলে বেঁটে লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে, দূর মিয়া কী যে কও। গরুর আবার এত দাম অয় নি!

সারা বছর গরুর পিছে যে খাওন-দাওন লাগে হের দামই হাজার হাজার টাকা কথাটা মহিমের জিভের ডগায় এসে ভেঙে যায়।

বেঁটে লোকটা নাছোড়বান্দা। সঙ্গের লোকটা তাকে বলল, শ্যামল, গরুজোড়া কিন্তু আমার পছন্দ হইছে। তুমি দাম ঠিক কর। সঙ্গের লোকটার কথায় মহিম বেঁটে লোকটার নাম জানে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায় বেঁটে লোকটা আসলে কে। অনেক কথা কাটাকাটির পর গরুর দাম ঠিক হল উনিশ হাজার পাঁচশো। বিশ হাজারের নীচে মহিমকে গরু বিক্রি করতে মানা করে দিয়েছে তার বউ। এদিকে সন্ধে হয়-হয়। বাজারে ভারতীয় গরুও উঠেছে বেশ। সবদিক চিন্তা করে শেষমেশ মহিম বিশ হাজার থেকে পাঁচশো টাকা ছাড় দিয়েছে। মহিমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাড় জিরজিরে টাইপের গরুর মালিক তাকে বুঝিয়েছে, শেষকালে পাঁচশো টাকার লাইগা গরু জোড়া না আবার বাড়িত ফেরত লয়া যাইতে হয়।

শেষমেশ মহিম ঐ দামেই গরু বিক্রি করল। অবশ্য টাকা দেওয়ার সময় বেঁটেমত লোকটা মহিমকে দুশো টাকা কম দিয়ে হাত ধরে ফেলেছে, দুইশো টাকা আবদার কইরা কম দিলাম। আটত্রিশটা পাঁচশো টাকার নোট আর তিনটা একশো টাকার নোট। একশো টাকার নোটগুলোকে মহিম শার্টের পকেটে রাখে। বাকি টাকা সে কায়দা করে রেখে দেয় লুঙ্গির নিচে আন্ডারওয়্যারের গোপন চেইনঅলা পকেটে। শহর থেকে এই আন্ডারওয়্যারটি সে কিনেছিল। টাকাগুলো খুব শক্ত করে বাঁধা। পথে যদি চোর-ছিনতাইকারী মহিমকে টাকার জন্য ধরে তবে সে আচমকা একটা কৌশল দেখিয়ে সবাইকে হতবাক করে দেবে। চোর-ছিনতাইকারী যখন তাকে ধরবে তখন সে করবে কী? শক্ত করে বাধা লুঙ্গির গেরোটা খুলেই লাগাবে এক দৌড়। আন্ডারওয়্যার পরে সে দেবে প্রচণ্ড এক দৌড়। অর্থাৎ যে কোন মারাত্মক পরিস্থিতির জন্য মহিম প্রস্তুত। তিনশো টাকা দিয়ে সে একটা রঙচঙা লাল গামছা আর বড় মেয়ের জন্য একটা বৰবন্ধনী কিনবে। তার বউ তাকে এসব জিনিস কিনে আনতে বলেছে। মহিম বউকে জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিয়েছে, দরকার, কাজে লাগবে। মহিম একটা দোকানে ঢুকে ঝটপট কিনে নেয় সেসব। জিনিসগুলো কাগজের প্যাকেটে মুড়ে নেয় যাতে কেউ দেখতে না পারে। দেখলে অবশ্য মহিমের এমন কিছুই হবে না। গ্রামের সবাই জানে মহিমের যুবতী মেয়ে আছে ঘরে। এ জিনিস তো লাগতেই পারে। লজ্জার কী আছে! তবুও মহিমের বড় লজ্জা।

তিন.

মরা খালটার কাছে আসতেই মহিমের মনটা বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে উতল হয়ে উঠল। খালের শরীর থেকে একটা হালকা ঝিরিঝিরি বাতাস তার মনকে যেন কেমন করে দিল। তার ভাল লাগতে শুরু করল। সে কিছুক্ষণ খালপাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধ্যারাত্তিরে খালের কালো জল তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। মহিম কেন যে খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা সে নিজেও বোঝে না। দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে তাই দাঁড়িয়ে থাকা। মানুষ মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত ভাল লাগায় আক্রান্ত হয়। এই যেমন এখন হয়েছে মহিম।

মহিম বাড়িমুখো হাঁটা দেয়। তার সঙ্গে আরো দু'চারজন। কারো হাতে টর্চ। কারো হাতে টিমটিমে হারিকেন। কারো আবার এসবের বালাই নেই। মহিমের হাতে একটা দিয়াশলাই। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সিগারেট। অন্ধকারে মহিমের হাতে জ্বলতে থাকা সিগারেটের আগুন দ্রুত ছোটাছুটি করে। দূর থেকে মনে হয় বুঝি-বা আলোর নাচন!

মহিম খুব সন্তর্পণে আন্ডারওয়্যারের গোপন পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করে তার টাকাগুলো নিরাপদে আছে। আশেপাশে তাকায় সে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। তারপর সে হাঁটা আরো দ্রুত করে।

মহিম বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। বাড়ির ভেতর থেকে পরপুরুষের গলা উঠে আসে। এক মানুষ সমান উঁচু বাঁশে কলাগাছের পাতা লম্বা করে ঝোলানো। কলাপাতাগুলো শুকিয়ে বেড়ায় পরিণত হয়েছে। বাতাসে কলাগাছের সেই বেড়া নড়েচড়ে উঠলে শর শর করে একটা আওয়াজ ওঠে। পুরুষের কণ্ঠটি মহিমের কাছে পরিচিত ঠেকে। পুরুষ কণ্ঠস্বর কলাপাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে উগলে বাইরে এসে পড়ছে, বিয়ার সময় কোন ট্যাকা-পয়সা লই নাই। অহন আমার ট্যাকার দরকার। তর বাপেরে ক ট্যাকা দিবার।

আমারে লয়া ভাগনের সময় তো ট্যাকার কথা কও নাই। অহন কও ক্যা? কথাগুলো বলে সরস্বতী দম নেয়, অহন এত ট্যাকা দিয়া তুমি কী করবা?

ব্যবসা না করলে তরে খাওয়ামু কী?

নখা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সরস্বতী ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। মহিমের বউ রান্নাঘরে ভাতের মাড় গালে। লাল চালের গন্ধ রাতের বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

বাবায় ট্যাকা পাইব কই?

ট্যাকা না দিলে ব্যবসা করুম ক্যামনে? ব্যবসা না করলে খাইবি কি? বিশ হাজার ট্যাকা অইলেই ব্যবসা করন যাইব।

নখার এক বন্ধু গুলিস্তানে পুরান ছেঁড়া-ফাটা টাকার ব্যবসা করে। নখার সেই বন্ধু নখাকে বলেছে, এ ব্যবসায় কোন ক্ষতি নাই। তুই খালি টাকা আইনা আমারে দে। লাভের চিন্তা আমার–

মহিম বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে সব শোনে। রাত এগিয়ে চলে সামনের দিকে। মহিমের কাছে গাছগাছালির সারিগুলোকে কেমন ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে লাগে। নখার টাকার কথা শুনে মহিমের কি যে হয়! সে অজানা এক ভয়ে কেঁপে ওঠে। হাতে ধরে রাখা বড় মেয়ের জন্য বাজার থেকে নিয়ে আসা জিনিসটা তার হাত থেকে পড়ে যায়। লুঙ্গির নিচে রাখা টাকাগুলো আবার পরখ করে দেখে নেয়। না, ঠিক আছে। তারপর বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিম। দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাজারে

মহিম বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। বাড়ির ভেতর থেকে পরপুরুষের গলা উঠে আসে। কলাপাতাগুলো শুকিয়ে বেড়ায় পরিণত হয়েছে। বাতাসে কলাগাছের সেই বেড়া নড়েচড়ে উঠলে শর শর করে একটা আওয়াজ ওঠে। পুরুষের কণ্ঠটি মহিমের কাছে পরিচিত ঠেকে। পুরুষ কণ্ঠস্বর কলাপাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে উগলে বাইরে এসে পড়ছে, বিয়ার সময় কোন ট্যাকা-পয়সা লই নাই। অহন আমার ট্যাকার দরকার। তর বাপেরে ক ট্যাকা দিবার।

বিবি-কা-মকবরা

ভ্রমণ

একরোখা সুলতানের খেয়ালিপনা

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ-দৌলতাবাদ ভ্রমণ

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া

পর্যটকরা ঔরঙ্গাবাদ যান সাধারণত অজন্তা-ইলোরা দেখতে। একই উদ্দেশ্যে আমি ও আমার সহধর্মিণী মধ্য প্রদেশ ঘুরে ভূপাল থেকে ট্রেনে মানমদ হয়ে সন্ধ্যায় ঔরঙ্গাবাদে আসি। সময়টা ছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহ। ৪ মার্চ আমরা সারাদিন ধরে বিশ্ববিখ্যাত অজন্তা গুহা দেখি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ মার্চ আমাদের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য ইলোরা গুহা দেখে পুনে চলে যাবার কথা। কিন্তু তা হল না।

কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানকার ইতিহাস আমাকে ডেকে বলে, আমার আরো অনেক কথা আছে। হাতের ইশারায় দেখায়, ওই দেখ, আমার আরো কীর্তি, আমার আরো স্থাপনা। ইতিহাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঔরঙ্গাবাদে আরো একদিন বেশি থেকে ইতিহাস বিজড়িত ঔরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ ও আশেপাশের কিছু এলাকা ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিই।

পানিচাক্কি

ঔরঙ্গজেবের ঔরঙ্গাবাদ

খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী রাজবংশ বাকাতক ও কালচুরিদের সময়কালে ঔরঙ্গাবাদের অনতিদূরের পাহাড়ে অজন্তা গুহা তৈরি হয়। তখন এই এলাকায় কোন শহর গড়ে উঠেনি, সমগ্র এলাকা ছিল বনাঞ্চল। তখন এর নামও ঔরঙ্গাবাদ হয়নি। ঔরঙ্গাবাদ শহর গড়ে ওঠে সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে।

ঔরঙ্গাবাদ শহরের পুরনো নাম ফতেনগর। এ শহর প্রতিষ্ঠা করেন আহমদ নগরের নিজাম শাহের উজিরে-আজম তথা আবিসিনিয়ার এক ক্রীতদাস মালিক অম্বর। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঔরঙ্গজেব ফতেনগরে এসে এর নাম বদলে রাখেন ঔরঙ্গাবাদ।

শহরের প্রধান সড়ক ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। শহরটির যেন আলাদা একটি নিজস্ব ধরন আছে। ঘরবাড়ির মধ্যে দেখা যায় মুঘল স্থাপত্যের চিহ্ন। চোখে পড়ে ঔরঙ্গজেবের আমলে তৈরি বিভিন্ন মসজিদ। শহরের রাস্তক্ষায় দেখা যায় সেই আমলের কিছু দরওয়াজা বা প্রবেশ তোরণ– যেমন 'রঙিন দরওয়াজা', 'কালা দরওয়াজা', 'মকাই দরওয়াজা' ইত্যাদি।

আমরা ড. আম্বেদকর রোড থেকে ডানদিকে বেঁকে খাম নদী পেরিয়ে আসি 'পানিচাক্কি'র সামনে। এটি ঔরঙ্গজেবের ধর্মগুরু বাবা শাহি মুজাফ্ফরের সমাধি ও দরগা। দরগায় আশ্রিত ফকির-দরবেশ অনাথদের প্রয়োজনে শস্য পেষার জন্য পানিচাক্কিটি বসানো হয়েছিল। পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে চাকা ঘুরিয়ে শস্য পেষা হত। তাই নাম পানিচাক্কি।

ঔরঙ্গাবাদ গুহা

পানিচাক্কি ছাড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে দেখি মুঘল স্থাপত্যের আরেক অপূর্ব নিদর্শন বিবি-কা-মকবরা। ঔরঙ্গজেবের প্রথমা পত্নী সম্রাজ্ঞী রাবিয়া-উদ-দুররানির সমাধিসৌধ এটি। ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাজমহলের অনুকরণে এটি নির্মাণ করেন। এটি 'গরিবের তাজমহল' নামে পরিচিত। শ্বেতশুভ্র সৌধটির স্থাপত্য খুবই দৃষ্টিনন্দন। জাফরির সূক্ষ্ম কাজ দেখার মত।

বিবি-কা-মকবরা দেখে আমরা আসি শহর ছাড়িয়ে ৩ কিলোমিটার দূরে ঔরঙ্গাবাদ গুহায়। চরানাদ্রি পাহাড়ের ধাপে ধাপে বিভিন্ন উচ্চতায় দশটি গুহা। গুহাগুলি রয়েছে পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে। পশ্চিমদিকে ১ থেকে ৫ নম্বর গুহা, পুবদিকে ৬ থেকে ১০ নম্বর গুহা। ২ নম্বর গুহায় রয়েছে ধর্মপ্রচাররত বিশাল বুদ্ধমূর্তি। ৩ নম্বর গুহা সুসজ্জিত, অলংকৃত ১২টি স্তম্ভে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর কার্ভিং ও জাতক-আখ্যানও সমৃদ্ধ করেছে গুহাটিকে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ৬ ও ৭ নম্বর গুহা দুটি অনবদ্য। ৬ নম্বর গুহা আজও অটুট। বিশাল বুদ্ধমূর্তি, উত্তরকালে হিন্দুর দেবতা গণেশও মূর্ত হয়েছেন ৬ নম্বর গুহায়। কেশ বিন্যাস ও অলঙ্করণে নারী মূর্তিটি অতুলনীয়। সিলিংও চিত্রিত। ৭ নম্বর গুহার ভাস্কর্য অভিনবত্বে ভরা। ছয় দেবী পরিবৃত হয়ে পদ্মহাতে পদ্মপাণি ও শাক্যমুনি– বাঁয়ে পাঁচিকা ও হারিতি। আরও বামে মুক্তির সন্ধানে বোধিসত্ত্ব। দেয়ালময় অনবদ্য কার্ভিংয়ে নর্তকী, সঙ্গীতজ্ঞ মূর্ত হয়েছে।

পর্যটকের ভিড় না থাকায় শান্ত পরিবেশে গুহাগুলি দেখতে বেশ ভাল লাগল। গুহা থেকে ঔরঙ্গাবাদ শহরকে অপূর্ব দেখায়। দূর থেকে দেখা যায় ঘন সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিবি-কা-মকবরার শ্বেতশুভ্র সৌধটি। ঔরঙ্গাবাদ গুহা থেকে বের হয়ে দক্ষিণমুখী পথে দৌলতাবাদ

বিবি-কা-মকবরা দেখে আমরা আসি শহর ছাড়িয়ে ৩ কিলোমিটার দূরে ঔরঙ্গাবাদ গুহায়। চরানাদ্রি পাহাড়ের ধাপে ধাপে বিভিন্ন উচ্চতায় দশটি গুহা। গুহাগুলি রয়েছে পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে। পর্যটকের ভিড় না থাকায় শান্ত পরিবেশে গুহাগুলি দেখতে বেশ ভাল লাগল। গুহা থেকে ঔরঙ্গাবাদ শহরকে অপূর্ব দেখায়। দূর থেকে দেখা যায় ঘন সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিবি-কা-মকবরার শ্বেতশুভ্র সৌধটি।

মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সুপণ্ডিত। বিশেষ করে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তবে একরোখা স্বভাব ও খামখেয়ালিপনার জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। খামখেয়লিপনার জন্য তাঁর ধর্মগুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে মতান্তর ঘটে। ব্যথিত গুরু অভিশাপ দেন, 'দিলি-দূর অস্ত'। লোকের বিশ্বাস, গুরুর অভিশাপেই তিনি আর দিলি-ত ফিরে যেতে

দূরে পারস্যস্থাপত্যরীতির সুরম্য মিনার

দুর্গের দিকে রওনা দিই।

একরোখা সুলতানের খেয়ালিপনার নিদর্শন দৌলতাবাদ

দৌলতাবাদ দুর্গের ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যময়। দুর্গটি প্রথম তৈরি করেন রাজা ভিলাম্মার। পরে এই দুর্গ দখল করেন আলাউদ্দিন খিলজি, গিয়াসুদ্দিন আইবেক। তারপরের ইতিহাস খুব চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর।

১১৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে মোহাম্মদ ঘোরি দিলি-ত প্রথম মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিলি-ত আজকের কনট পে-স্র ১৫ কিমি পূর্বে তুঘলকাবাদ গড়ে তোলেন। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র মুহম্মদ বিন তুঘলক দিলির মসনদে বসেন। বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ভারত ভ্রমণে এসে বেশ কিছুদিন তাঁর দরবারে অবস্থান করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সুপণ্ডিত। বিশেষ করে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তবে একরোখা স্বভাব ও খামখেয়ালিপনার জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। খামখেয়লিপনার জন্য ধর্মগুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে। ব্যথিত গুরু অভিশাপ দেন, 'দিলি-দূর অস্ত'। লোকের বিশ্বাস, গুরুর অভিশাপেই তিনি আর দিলি-ত ফিরে যেতে পারেননি এবং আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ও তুঘলক বংশের ধ্বংস।

তুঘলকের খামখেয়ালিপনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ– মসনদে আরোহণের পাঁচ বছর পর রাজ্যপাট দিলি-থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে স্থানান্তর। এক ফরমান বলে তিনি দিলির সকল প্রজা এবং তাঁর সৈন্য-সামন্তকে ১১২০ কিমি পথ পায়ে হেঁটে দেবগিরিতে যেতে বাধ্য করেন। দেবগিরির নাম বদলে রাখেন দৌলতাবাদ যার অর্থ 'সৌভাগ্যের নগরী'। কিন্তু তারপরেও তিনি সৌভাগ্যের দেখা পাননি। দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়েনি– জলাভাব, ক্ষরা, দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে ১৭ বছর পর আবার ফিরে যান দৌলতাবাদ থেকে দিলি-। যাতায়াতে বিপুল প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হয়।

মুহম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদে এসে প্রথমে দুর্গটিকে আরো দুর্ভেদ্য ও আয়তনে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সমতলের মাঝে ৬০০ ফুট উঁচু পিরামিডের মত খাড়া আগ্নেয়শিলার পাহাড়। এই পাহাড়চূড়ায় ৫ কিমি দীর্ঘ মজবুত প্রাচীরে ঘিরে দৌলতাবাদ দুর্গকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় করে তোলেন।

আমাদের গাড়ি দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকি। দুর্গের চারপাশে আছে গভীর পরিখা। প্রবেশপথে পরিখার সেতুটি সেকালে গুটিয়ে নেওয়া যেত দুর্গ থেকে। পরিখার জল থাকত কুমিরে ভর্তি। দুর্গের ঘনান্ধকার পথে শত্রুকে বিভ্রান্ত করে দুটি ভুলপথে নিয়ে যাবার জন্য ছিল ভুলভুলাইয়া। দ্বিমুখী পথের একটি মিলেছে গরম তেলে, অন্যটি হিংস্র কুমিরে আকীর্ণ গভীর পরিখার জলে।

দুর্গের চত্বরে আছে কুতুব মিনারের আদলে পারস্য স্থাপত্যরীতিতে তৈরি ২০০ ফুট উঁচু গোলাপী রঙের এক সুরম্য মিনার। দক্ষিণ ভারত জয়ের স্মারকরূপে ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন বাহমনি এ মিনার নির্মাণ করেন। একসময় মিনারের গয়ে সুন্দর টালির নকশা ছিল। মিনারের বিপরীতে জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত জুমা মসজিদ। মসজিদ চত্বরে পুরনো জৈন-মন্দিরের স্তম্ভগুলি আজও দৃশ্যমান। জুমা মসজিদ ছাড়িয়ে সংকীর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে পরিখা পার হয়ে ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত ২০ ফুট দীর্ঘ পঞ্চধাতুর তৈরি কিলা শিকন

আমাদের গাড়ি দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকি। দুর্গের চারপাশে আছে গভীর পরিখা। প্রবেশপথে পরিখার সেতুটি সেকালে গুটিয়ে নেওয়া যেত দুর্গ থেকে। পরিখার জল থাকত কুমিরে ভর্তি। দুর্গের ঘনান্ধকার পথে শত্রুকে বিভ্রান্ত করে দুটি ভুলপথে নিয়ে যাবার জন্য ছিল ভুলভুলাইয়া। দ্বিমুখী পথের একটি মিলেছে গরম তেলে, অন্যটি হিংস্র কুমিরে আকীর্ণ গভীর পরিখার জলে।

দুর্গের প্রধান ফটক

দুর্গের চারপাশের গভীর পরিখা

কামান। তারপর টানেল পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে চিনিমহল প্রাসাদ। এখন বয়সের ভারে জরাজীর্ণ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে আরো ওপরে উঠে বরাদরি রানীর প্রাসাদ। পাহাড়ের মাথায় এই প্রাসাদ দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায়। উত্তরকালে শাহজাহানও কিছুকাল বাস করেন বরাদরি প্রাসাদে। বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সঙ্গে পালস্না দিয়ে প্রাসাদ ও দুর্গের অন্যান্য স্থাপনার স্থাপত্যকলা দর্শকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। দুর্গ-পাহাড়ের ওপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুবই সুন্দর। দুর্গ-পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

ধীরে ধীরে দুর্গের পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসি। নীচে নামাও কম কষ্টের নয়। তারপর হোটেলে ফিরে যাই।

খুলদাবাদ

৬ মার্চ সকালে জলখাবার সেরে আমরা ইলোরা গুহা দেখার জন্য বের হই। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ইলোরার দূরত্ব ৩০ কিমি। ঔরঙ্গাবাবাদ-ইলোরার পথে গুহার ৫ কিমি আগে পড়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধি। জায়গাটির নাম খুলদাবাদ। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সম্রাটের সমাধির দিকে এগিয়ে যাই।

অনাড়ম্বর জীবনের অভিলাষী সম্রাটের ইচ্ছানুসারে খোলা আকাশের নীচে তৈরি হয় অতি সাধারণ সৌধহীন সমাধি। পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদের নিজাম সমাধিকে ঘিরে চমৎকার জাফরির কাজ করা শ্বেতপাথরের একটি বেষ্টনী দিলেও সমাধির ওপরটি খোলাই থাকে। কেবল একটি বনতুলসীর গাছ দেখলাম সমাধির ওপর। সাদা চাদরে ঢাকা সমাধি বেদির ওপর বনতুলসীর গাছটি যেন আড়ম্বরহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমাধিটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃহন্তা সেই সম্রাটের জন্যও মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখে আমরা ইলোরার পথে রওনা দিই।

দুর্গ-পাহাড়ের মাথায় বরাদরি রানীর প্রাসাদ

ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে আরো ওপরে উঠে বরাদরি রানীর প্রাসাদ। উত্তরকালে শাহজাহানও কিছুকাল বাস করেন বরাদরি প্রাসাদে। বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সঙ্গে পালা- দিয়ে প্রাসাদ ও দুর্গের অন্যান্য স্থাপনার স্থাপত্যকলা দর্শকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। দুর্গ-পাহাড়ের ওপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুবই সুন্দর। দুর্গ-পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

প্র য়ো জ নী য় ত থ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে প্রথমে যেতে হবে জলগাঁও। হাওড়া থেকে জলগাঁও যায় গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর), আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস, মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ), আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস।

জলগাঁও থেকে ঔরঙ্গাবাদ যাবার জন্য জলগাঁও-ঔরঙ্গাবাদ বাস সার্ভিস আছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বাসে ঘণ্টাতিনেকের পথ। হাওড়া-মুম্বই রেলপথে মানমদ স্টেশনে ট্রেন বদল করে ঔরঙ্গাবাদ যাওয়া যায়। মানমদ থেকে ঔরঙ্গাবাদের দূরত্ব ১১৪ কিমি। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা ১০২ কিমি।

ঢাকা বা কলকাতা থেকে সরাসরি বিমানে মুম্বই পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে ঔরঙ্গাবাদ যাওয়া যায়। ঔরঙ্গাবাদে যাবার লাক্সারি বাস সার্ভিসও আছে।

কোথায় থাকবেন

ঔরঙ্গাবাদে থাকার জন্য স্টেশন রোডে রয়েছে এমটিডিসি হলিডে রিসর্ট। এছাড়া ঔরঙ্গাবাদে রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড– দুইয়ের মাঝে বিভিন্ন মানের অনেক প্রাইভেট হোটেল রয়েছে।

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া পর্যটক

অনাড়ম্বর জীবনের অভিলাষী সম্রাটের ইচ্ছানুসারে খোলা আকাশের নীচে তৈরি হয় অতি সাধারণ সৌধহীন সমাধি। পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদের নিজাম সমাধিকে ঘিরে চমৎকার জাফরির কাজ করা শ্বেতপাথরের একটি বেষ্টনী দিলেও সমাধির ওপরটি খোলাই থাকে। কেবল একটি বনতুলসীর গাছ দেখলাম সমাধির ওপর। সাদা চাদরে ঢাকা সমাধি বেদির ওপর বনতুলসীর গাছটি যেন আড়ম্বরহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন **ড. দুলাল ভৌমিক**

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু কি শোরযুবা বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আ শর্চয ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। একা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্য গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপণ্ডিত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্যবীর্য, দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা ষোলটি পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ পুতুলের গল্প:

সপ্তদশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ কিছুক্ষণ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে পুনরায় সিংহাসনে বসার উদ্যোগ নিলেন। এমন সময় সপ্তদশ পুতুলটি বলল: হে ভোজরাজ! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত পরের উপকারার্থে নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ না করেন, তাহলে এই দৈব সিংহাসনে বসার উপযোগী বিবেচিত হবেন।

ভোজরাজ বললেন: পরের জন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি করেছিলেন?

পুতুলটি বলতে লাগল: দূরের কোন এক রাজ্যে বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি হচ্ছিল। মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির। খেতে ফসল নেই। রাজ্যজুড়ে চরম দুর্ভিক্ষ। প্রজারা দল্লেদ লে মারা যাচ্ছে। রাজার কর্তব্য প্রজাদের পালন করা। কিন্তু তিনি তা পারছেন না। কোন এক কারণে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র রুষ্ট হয়ে আছেন। তাই রাজা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– ইন্দ্রের উদ্দেশে এক যজ্ঞ করবেন এবং সেই যজ্ঞের আগুনে তিনি আত্মাহুতি দেবেন।

এই সংবাদ একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কানে পৌঁছয়। তিনি কালবিলম্ব না করে দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে পৌঁছে যান সেই রাজ্যে। গিয়ে দেখেন রাজা আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। রাজ পরিবারের সবাই গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। এমন সময় মহারাজ গিয়ে সেই রাজাকে নিরস্ত করলেন। তাঁর পরিবর্তে তিনি নিজে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। হাসিমুখে তিনি যখন আগুনে ঝাঁপ দেবেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এসে উপস্থিত। তিনি মহারাজকে আশীর্বাদ করে বললেন: হে বৎস! তোমাকে আর আত্মাহুতি দিতে হবে না। পরের জন্য তোমার এই আত্মবিসর্জনের মানসিকতা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এখনই বৃষ্টি নামবে এবং সমস্ত খেত ফসলে ভরে উঠবে। তুমি তোমার নিজের রাজ্যে ফিরে যাও।

এই বলে ইন্দ্রদেব চলে গেলেন। মহারাজও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর ঐ রাজ্যে অঝোরে বৃষ্টি নামল এবং সমস্ত খেত ফসলে ভরে উঠল। রাজ্যবাসী সবাই মহারাজকে ধন্যধন্য করতে লাগল।

কাহিনি শেষ করে পুতুলটি বলল: হে ভোজরাজ! এই সিংহাসনে বসতে হলে আপনাকেও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পরোপকারী হওয়া উচিত।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ নিরুত্তর রইলেন।

অষ্টাদশ পুতুলের গল্প

অনেকক্ষণ নীরব থেকে ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণের উদ্যোগ নিলেন। এমন সময় অষ্টাদশ পুত্তলিকা বলে উঠল: রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সাহসী মহানুভব ও দানশীল হন, তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

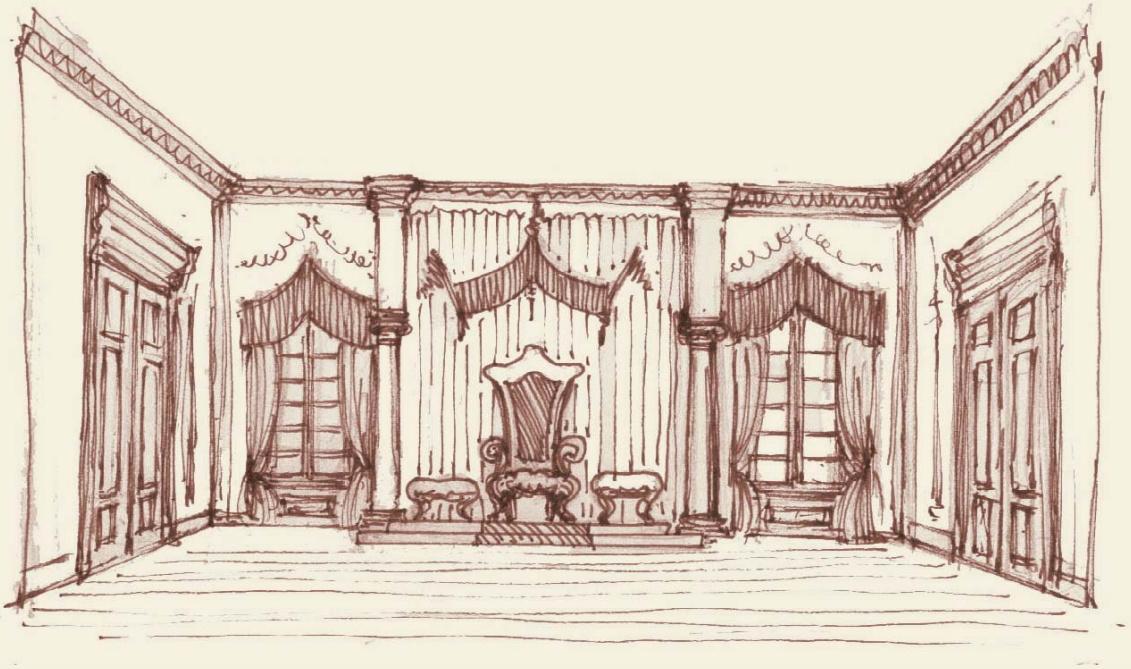

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি রকম সাহসী মহানুভব ও দানশীল ছিলেন?

পুত্তলিকা বলল: তবে শুনুন। একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় এসে বললেন: মহারাজ! আমি একজন পরিব্রাজক। আমার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাসও করি না। যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই।

মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি তো দেশ্লবি দেশ ঘুরে বেড়ান। কোথাও কি আশ্চর্যজনক কিছু দেখেছেন?

পরিব্রাজক বললেন: মহারাজ! উদয়াচল পর্বতে সূর্যদেবের এক বিশাল প্রাসাদ আছে। তার পাশ দিয়ে বিপদনাশিনী গঙ্গা প্রবাহিতা। তার তীরে বিপদনাশন শিবের একটি মন্দিরও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সেখানে প্রতিদিন সকালে গঙ্গাবৰ থেকে নবরত্ন খচিত একটি সিংহাসন উত্থিত হয়, আবার সূর্য অস্ৰাচলে গেলে সিংহাসনটি গঙ্গাবৰে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কেউ তার কাছে যেতে সাহস পায় না।

এ্লকথা শুনে মহারাজ আর বিলম্ব করলেন না। পরিব্রাজককে নিয়ে চলে গেলেন উদয়াচল পর্বতে। সূর্যোদয়ের সঙ্গেস ঙ্গে রত্নখচিত সেই সিংহাসনটি উত্থিত হল। মহারাজ নির্ভয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। চোখের পলকে সূর্যতাপে তাঁর দেহ গলে একটি মাংসপি- পরিণত হল। কিন্তু মহারাজ সেই অবস্থায়ই সূর্যদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে দিব্য দেহ দান করে বললেন: বৎস! তোমার সাহস আর স্তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

মহারাজ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: দেব! আপনার দর্শন লাভেই আমি ধন্য হয়েছি। আমার আর কি বর চাই?

মহারাজের এই বিনয়ে তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব তাঁকে একটি স্বর্ণকু-ল দান করলেন এবং বললেন: এ থেকে প্রতিদিন একবার স্বর্ণ নির্গত হবে।

মহারাজ কু-লটি নিয়ে রাজধানীতে ফিরছিলেন। পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাৰাৎ হয়। ব্রাহ্মণ তাঁর অভাব্লঅনট নের কথা জানালে মহারাজ তাঁকে সেই কু-লটি দিয়ে দিলেন।

বিক্রমাদিত্যের এই সাহস, মহানুভবতা ও দানশীলতার কাহিনি বলে পুতুলটি ভোজরাজের উদ্দেশে বলল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় এরূপ গুণসম্পন্ন হন তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ আর অগ্রবর্তী হলেন না।

ঊনবিংশ পুতুলের গল্প

এবার ভোজরাজ ঊনবিংশ পুত্তলিকার মস্তকে পা রেখে সিংহাসনে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। তখন পুত্তলিকা বলে উঠল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় উদার ও পরোপকারী হন, তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি রকম উদার ও পরোপকারী ছিলেন?

পুত্তলিকা বলল: শুনুন তাহলে। মহারাজ একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে একটি বন্য শূকরের পেছনে ছুটত্লেছুট তে এক বিশাল পর্বতের গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহায় প্রবেশ করে তিনি তো বিস্ময়ে হতবাক! গুহার প্রাচীর সোনার পাতে মোড়া। অভ্যন্তরে স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদসমূহ। একটু এগোতেই দেখতে পেলেন রত্নখচিত এক বিশাল প্রাসাদ। এটি আসলে দৈত্যরাজ বলির রাজপ্রাসাদ। মহারাজের আগমন বার্তা পেয়ে বলিরাজ এগিয়ে এলেন। মহারাজকে আলিঙ্গন করে বললেন: আপনি আমার অতিথি, বন্ধু। দানের মাধ্যমে, দান গ্রহণের মাধ্যমে, গোপন কথা বলার মাধ্যমে এবং পারস্পরিক ভোজনাদির মাধ্যমে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। তাই বলুন, আপনার কি কাম্য?

মহারাজ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: আমার কোন কাম্য নেই। তবে আপনার দানও আমি অগ্রাহ্য করব না।

মহারাজের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বলিরাজ তাঁকে দুটি আশ্চর্য বস্তু দান করলেন– রস ও রসায়ন। এর কার্যকারিতাও বলে দিলেন। মহারাজ তা নিয়ে বলিরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে মহারাজের সাৰাৎ হল। ব্রাহ্মণ মহারাজকে আশীর্বাদ করে বললেন: আমি খুব গরিব। অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করি। দারিদ্র্য এক চরম অভিশাপ, মহারাজ!

মহারাজ ব্রাহ্মণের কথা শুনে বললেন: হে ব্রাহ্মণ! আমি মৃগয়ায় বের হয়েছিলাম। আমার কাছে তো এখন কোন ধন্নস ম্পদ নেই। তবে দুটি মূল্যবান বস্তু আছে– রস ও রসায়ন। এই রসের স্পর্শে য়ে কোন ধাতু মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়। আর এই রসায়ন পান করলে অমরত্ব লাভ হয়। আপনি চাইলে এর য়ে কোন একটি নিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ চিন্ৰা করলেন: এই বৃদ্ধ বয়সে সোন্মদানা দি য়ে আর কি হবে? তার চেয়ে অমরত্ব লাভই শ্রেয়। তাই তিনি রসায়ন চাইলেন।

কিন্তু তাঁর পুত্র ভাবল: দরিদ্র ব্যক্তির অমরত্ব দিয়ে কি হবে? দরিদ্র অমর হলেও কেউ তাকে মূল্য দেয় না। তাই সে চাইল রস।

এ নিয়ে পিত্মপু ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কিছুতেই এর সমাধান হচ্ছে না। তখন মহারাজ দুটি বস্তুই তাদের দিয়ে দিলেন। এতে ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্র উভয়ই তুষ্ট হলেন। তাঁদের তুষ্টি দেখে মহারাজও খুশিমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পুত্তলিকার কথা শেষ হলে ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক
শিৰাবিদ, প্রাবন্ধিক

ছোটগল্প

হাঁপের টান

অনিন্দিতা গোস্বামী

ঢাক বাজলেই সদানন্দের হাঁপের টান বাড়ে, যেন হাপর টানছে। হেঁই হেক্কা হেই, হেঁক্কা হেই। দাঁত কিড়মিড় করে খোকন সরকার, বুড়ো মরবেও না, পথও ছাড়বে না। বচ্ছরকার দিন, লোকে কোথায় বউ-বাচ্চা নিয়ে একটু ফুর্তি করবে, তা বুড়োর সহ্য হবে না। হিক্কা তুলে তুলে মরবে। একটা উৎসব আনন্দ গেল না যখন বুড়ো সবাইকে ব্যতিব্যস্ত না করে তুলল। আসলে নিজের কাল গিয়েছে। এখন অন্যদের আনন্দ মজা দেখলে চোখ টাটায়।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল খোকন। বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি, যমের দুয়োরে দিয়ে আসছি তোমায়। পুজোর সময় একটু হাসপাতালের মুখ না দেখলে তোমার শান্তি হয় না। বুঝি বুঝি সব বুঝি, ঘাটে যাবার কাল হল তবু হিংসা গেল না। নিজে শখ-আহ্লাদ করিনি, তোরা করবি কেন।

হাঁপ তুলতে তুলতেই সদানন্দ বললেন, কি যে বলিস খোকা, এসময়টা ঠাণ্ডা-গরম, ঠাণ্ডা-গরম, কফটা বুকে বসে যায়। পায়ে হেঁটে যে যাওয়া যায় না, না হলে কবেই নিজে পায়ে হেঁটে যমের দুয়োরে যেতাম, তোদের কি আর এমন কষ্ট দিতাম বল।

খোকন চলে যায় ঘর থেকে। সদানন্দ ভাবেন আর কত কাল। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আসছে, মুঠোই হয় না। মাটি আর আঁটকে রাখা যাবে না। ভয়ে রাতে ঘুম হয় না সদানন্দের। যদি কেউ ঘুমের ঘোরে টিপ ছাপ মারিয়ে নেয়। সদানন্দ ছিলেন প্রাইমারি ইসকুলের মাস্টার। জমি-জমাও করেছিলেন দু'এক বিঘে। খাওয়ার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু সন্তান বাঁচত না তার। পরপর তিন তিনটে ছেলে মারা গেল। কি মনে করে সদানন্দ উঠোনের পশ্চিম কোণে তুলসীতলার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কেঁদে পড়েছিলেন একদিন, তোমার মাটি রৰা করবার একটা ছেলে রাখ নারায়ণ।

খোকন বলল, হুঁ তুমি যাবে যমের দুয়োরে। তাহলেই হয়েছে। একটু হাঁচি-কাশি হতে না হতে মুঠোমুঠো ওষুধ গিলছ। বয়সের তো গাছপাথর নেই তবু বাঁচার কি শখ। ছেলে না গিলে তুমি যমের বাড়ি যাবে না বেশ জানি।

সদানন্দ কপালে হাত ঠেকান। থাকার মধ্যে আছে তো ঐ ছেলেটা আর নাতিটা– তাও এ কি কুলক্ষুণে কথা কয় খোকন। তিন তিনখান ছেলে মরে তবে এই খোকনটা বেঁচে ছিল। কত মানত চড়িয়েছিল বিমলা। সত্যি বিমলা তুমি ভাগ্যবতী সতী। ভালয় ভালয় বেলা থাকতে থাকতে হাঁটা দিলে আর আমি সংসারের পাঁকের মধ্যে পড়ে রইলাম।

সদানন্দ মরেন না। দিন যায় বছর যায় মাস যায়, সদানন্দ দিব্যি বেঁচে বসে থাকেন। মাঝে মধ্যে এক একবার শুধু হাসপাতাল থেকে বুকে বাতাস ভরে আসেন, ব্যাস, আর কোন সমস্যা নেই। তবু যেন সদানন্দ না মরলে খোকন শান্তি পায় না, ভাবলে অবাক লাগে সদানন্দর। এই খোকনকে বাঁচানোর জন্য তিনি আর বিমলা ছুটেছেন ঠাকুরবাড়ি।

সদানন্দ মরলে খোকনের অনেক সুবিধা। বাড়ির দৰিণখোলা ঘরখানা আটকে রেখেছেন সদানন্দ, ঐ ঘরখানা পেলে বড় ছেলের পড়ার ঘর করত খোকন। সদানন্দ বলেছিলেন, আমি তো এক কোণে চৌকিতেই পড়ে থাকি। তোর ছেলে চেয়ার-টেবিল পেতে পড়ুক না ঘরের অন্য কোণে।

খোকন বলেছিল, শুনলে তোমার ভাল লাগবে না বাবা। তোমার ঘরে বোঁটকা গন্ধ, বড় নোংরা তুমি, কফ থুতু পেচ্ছাব– সবতো ঘরেই সারছ।

তা ঠিক সদানন্দের একখান কৌটো আছে পেচ্ছাবের। চার-পাঁচ বারেরটা জমিয়ে ফেলতে যান। বার বার বাইরে যেতে শরীর নেয় না। তা নাতির জন্যে বলেছিলেন, তা না হয় বাইরেই যাব কষ্ট করে, ও পড়ুক না এখানে।

খোকন খেঁকিয়ে উঠেছিল, আর তোমার শ্বাস টানার শব্দ, তুমি যে বেঁচে আছ, সবাইকে তো জানান দিয়ে ছাড়।

না, সদানন্দ জানেন সমস্যা আসলে ঘরের না। সমস্যা আরো জটিল, আর সেই কারণটাই খোকনকে এমন ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

সাঁই সাঁই করে আরো দু'বার শ্বাস টানলেন সদানন্দ। তারপর বললেন, খোকন তোর মা এসেছিল কাল, বলল, এই থান কাউরে দিবা না, এ সতীমায়ের থান, স্বামী থাকতে আমি মরছি– আমি সতী না কও?

খোকন বলল, এই তো গাঁজাখুরি গল্প দিতে আরম্ভ করলে আবার। মরবার আগে বাড়িটা আমাকে দেবে না এই তো, মরা মাকে ধরে টানাটানি কর কেন?

– ওমা, আমার আর আছে কে, আছিস তো তোরা, দেব না আবার কি, তবে হ্যাঁ, বেচতে পারবি না।

– সারা জীবন এই গাঁয়ে পচে মরতে হবে।

– মরবি কেন বাছা, তোর যমের দুয়োরে আগেই কাঁটা বিছিয়ে রেখেছি। এই গাঁয়ে কি মানুষ নেই?

– এরা চাষাভুষো সব। আমার মত শহরের বাবু হয়ে কে গাঁয়ে পড়ে আছে বল দেখি।

– তোর অপিস তো এখান থেকে এক ঘণ্টা, গেলিই না হয় ট্রেনে। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ রিফিউজি হয়? ওরে সে যে কী জ্বালা তোরা বুঝবি না।

– আরে এতে রিফিউজির কি আছে। আমি এখানকার বাড়ি বিক্রি করে শহরে একটা ফ্ল্যাট কিনব। সেটাও তো আমারই।

– ধুস্! ওকি বাড়ি নাকি? ফ্ল্যাট মানে তো বাসা, একচিলতে ঘর, নিজের উঠোন নেই, বাগান নেই, আমগাছ নেই, তুলসীতলা নেই।

– আমার ওসব দরকার নেই বাবা, আমার অপিসের সবার ছেলেরা ইংলিশ মিডিয়াম ইসকুলে পড়ে। আমার ছেলেটা গাঁয়ের ইসকুলে পড়ে গোমুখ্য হয়ে থাকবে।

– তুইও তো গাঁয়েই পড়েছিলি।

– পড়েছিলাম বলেই তো কেরানি হয়েছি।

– না হলে কি হতিস?

– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।

– বিশু ডাক্তার, ওতো আমাদের গাঁয়ের ইসকুলের ফার্স্ট বয় ছিল।

– শুধু তর্ক কোরো না তো বাবা, সবাই কি ব্রিলিয়ান্ট হয়!

– ঠিক কথা, শহরে গেলেই কি সবাই ব্রিলিয়ান্ট হয়ে যায়।

– ও! তবে তুমি বাড়িটা বিক্রি করতে দেবে না?

– না।

– এই তোমার শেষ কথা?

– হ্যাঁ।

খোকন চলে যায় ঘর থেকে। সদানন্দ ভাবেন আর কত কাল। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আসছে, মুঠোই হয় না। মাটি আর আঁটকে রাখা যাবে না। ভয়ে রাতে ঘুম হয় না সদানন্দের। যদি কেউ ঘুমের ঘোরে টিপ ছাপ মারিয়ে নেয়। সদানন্দ ছিলেন প্রাইমারি ইসকুলের মাস্টার। জমি-জমাও করেছিলেন দু'এক বিঘে। খাওয়ার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু সন্তান বাঁচত না তার। পরপর তিন তিনটে ছেলে মারা গেল। কি মনে করে সদানন্দ উঠোনের পশ্চিম কোণে তুলসীতলার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কেঁদে পড়েছিলেন একদিন, তোমার মাটি রৰা করবার একটা ছেলে রাখ নারায়ণ।

ভয়ে বুক কাঁপে সদানন্দের। খোকন এসব কথা কিছুই বিশ্বাস করে না। ভাবে বাপের ভিটে আগলে থাকার তাল। ভিটে বেচে দিলে যদি ছেলে কেড়ে নেন নারায়ণ। এই বয়সে আবার কি সব হারাবেন সদানন্দ নতুন করে! এখন যে বিমলাও নেই, মাথা রেখে কাঁদবার জায়গাটুকুও যে আর নেই।

আবার হাঁপ ওঠে জোরে জোরে, হুক্কা হই হুক্কা হই। খোকনের বউ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় মুখের ওপরে। বলে, বাব্বা যেন শেয়ালের কান্না। কত দিন যে এই ঘাটের মড়াকে টানতে হবে কে জানে। সদানন্দ ভাবেন, ফ্ল্যাট বাড়ি তো এতটুকু। যদি আমার জায়গা না হয় ওখানে। যদি আমাকে ফেলে দেয় ফুটপাতে– শিউরে ওঠেন সদানন্দ, ও! সে যে ভারী কষ্ট।

পাকিস্তানের পুলিশ যেদিন হিঁচড়িয়ে পাট খেতে টেনে নিয়ে গেল সদানন্দের দিদিকে, সেদিন রাতেই বগলে পোঁটলা নিয়ে ওরা শুরম্ন করেছিলেন দৌড়, মা, বাবা, ভাই, ছোটবোন আর তিনি। দিদি! দিদি কী আজও বেঁচে আছে! তাই কি কেউ বাঁচে? এসব গল্প এখানে কেউ জানে না। কোন কথা ওরা ভাই-বোনেরা কেউ বলেননি কাউকে। দিদি নেই। ওরা তিন ভাইবোন পথে পথে ঘুরেছে। ক্যাম্পে কাটিয়েছে। একটা কম্বলের জন্যে মারামারি করে খুন হতে হতে বেঁচে গেছে সদানন্দের

পরের ভাই। সেই সদানন্দ প্রাইমারি ইসকুলে চাকরি জোগাড় করেছেন। নুন ভাত খেয়ে মা-বাবাকে দেখেছেন। বোনের বিয়ে দিয়েছেন। ভাইকে পড়িয়েছেন। ভাইয়েরও মাস্টারি জুটিয়ে দিয়েছেন পাশের গাঁয়ে। চাকরি পেয়েই ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছে। সংসারের দায় নেয়নি কাঁধে। যতদিন মা-বাবা ছিল মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠিয়েছে– এই পর্যন্ত।

যে যাক কোন ক্ষোভ নেই আজ আর কারো ওপরে। সদানন্দের অভাব থাকলেও অনটন হয়নি কোনদিন, সুখ না থাকলেও শান্তির কমতি হয়নি কোনদিন। কিন্তু পথের জীবনগুলো যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত তাকে। দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা হবার ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠত সদানন্দের গা। কথা আটকে যেত কণ্ঠনালীতে। ঢাক বাজলেই যে তার মনে হত পাইপগানের আওয়াজ। বোধনেই মনে হত বিসর্জন। পদ্মাপারে ফেলে আসা দিদির কথা, যতদিন বিমলা ছিল, খোকন ছোট ছিল– ততদিন বিমলা কথায় কথায় ভুলিয়ে রাখত সবকিছু। এখন যে তিনি একা, স্মৃতিগুলোই যে এখন তাঁর সঙ্গী। সুখ-দুঃখ মিলেমিশে একাকার। কখনো তিনি স্মৃতির সঙ্গে হাসেন, কখনো কাঁদেন আর বর্তমানকে ভয় পান। বর্তমান মানে তাঁর কাছে শুধুই ভয়– জরার ভয়, ছেলের জোরের ভয়, প্রতাপের ভয়, ভিটে হারানোর ভয়, শুধু ভয়।

খোকন কবে থেকে এ জমি এ বাড়ি বিক্রির জন্যে ক্ষেপে উঠল? মনে করার চেষ্টা করেন সদানন্দ। খোকনের বিয়েতে বিমলা জোর করে বরপণে আদায় করল একখান রঙিন টিভি। তারপর থেকেই এই রোগ ছড়ালো খোকনের মনে। রঙিন টিভির লাল নীল আলো, সন্ধ্যে হতেই যেন রোশনাই। বিমলা আর দেখল কতটুকু! বউমা টিভি নিয়ে গিয়ে তুলল নিজের ঘরে। তারপর থেকেই শুধু বায়নাক্কা, এই এনে দাও, ওই এনে দাও। হাঁপ লাগে বউমার এই ঘরে। ঘর লাগোয়া বাথরুম নেই, উঠোন পেরিয়ে পায়খানা, এই রান্নাঘরে কি অমন রকমারি রান্না করা যায়। তারপর যখন নাতিটা হল, ও বাবা টুইংকিল টুইংকিল লিটিল স্টার, ইংলিশ মিডিয়ামে না পড়ালে নাকি জীবনই বৃথা!

সদানন্দ সারাজীবন খোকা-খুকুদের পড়িয়ে এসেছেন, তার ছাত্রদের সব মুক্তোর মত হাতের লেখা। কত দিন ডেকেছেন নাতিটাকে, আয় দাদু পড়াই। হাই হাই করে তেড়ে এসেছে বউমা। আর বিমলা মারা যেতেই ক্ষেপে উঠল খোকন। শহরে যাবে, ফ্ল্যাট কিনবে। এ বাড়ি বেচে দেবে। এখন বেচতে গেলে তো সদানন্দের সই চাই। বাড়ি যে এখনো সদানন্দের। কিন্তু সদানন্দের এক গোঁ। বাড়ি বেচবেন না। এই নিয়েই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে আদায় কাঁচকলায়। সদানন্দের মৃত্যু চেয়ে ছেলে-বউমা ঠাকুরের কাছে কপাল ঠুকছে দু'বেলা।

সেদিন খোকন এসে খবর দিল, নাও বাবা তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমার বাড়ি তুমি গলায় ঝুলিয়ে থাক। আমি শহরে ফ্ল্যাট বুক করে এলাম। আঁতকে উঠলেন সদানন্দ, এ্যাঁ টাকা কোথায় পেলি, কারো গাঁট কাটলি নাকি?

– গাঁট কাটব কেন, লোন নিয়েছি অপিস থেকে।

– ধার করলি।

– ধার নয় বাবা লোন। এখন সবাই নেয়। ব্যাংকগুলো এখন লোন দেবার জন্যে বসে আছে। কি করব বল, তোমার জন্যে তো আর বসে থাকতে পারি না।

– এখান থেকে চলে যাবি?

– হ্যাঁ।

– কত টাকা ধার নিলি?

– সে যতই নিই, তোমার কি, তুমি বাড়িটা বিক্রি করলে একটু ভাল ফ্ল্যাট বুক করতে পারতাম। সামান্য ক'টা টাকা মাইনে পাই, কত আর লোন পাব বল? বড় ফ্ল্যাট বুক করলে তুমিও থাকতে পারতে আমাদের সঙ্গে।

– এখন কোথায় থাকব?

– কেন তোমার বাড়িতে। এ বাড়িতে আমার আর কোন ইন্টারেস্ট নেই। এতকাল অনেক বলেছি। এখন তুমি বাড়ি নিয়ে যা খুশি কর।

সদানন্দ অসহায়ের মত বলেন, এ বাড়ি তো তোরই খোকন, তুই ছাড়া আমার আর আছে কে? আমি একা এ বাড়িতে কি করে থাকব! তোদের ধরে রাখার জন্যেই তো... কথা শেষ করতে পারলেন না সদানন্দ, হাঁপের টান উঠল– হাই হাক্কা, হাই হাক্কা। বাতাস খুঁজতে লাগলেন সদানন্দ।

একটা ঘর নয়, আগের মত আবার গোটা বাড়িটাই সদানন্দের। উঠোন, বাগান সব– ছেলে বলেছিল দুটো ঘরে ভাড়া বসাবে। আবার সেই গোঁ ধরেছিলেন সদানন্দ, উঁহু এ বাড়িতে কোন ভাড়া নয়। খোকন গজ গজ করেছে, মরে তো উল্টে পড়ে থাকবে।

– সে থাকলে থাকব। মরবার পরে চিৎ আর উল্টো, সবই সমান।

ছেলেরা বাড়ি ছাড়ার দিন, সব মালপত্র যখন লরিতে ওঠানো হল, সদানন্দ তুলসীতলার এক দলা মাটি ঠোঙায় ভরে বউমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমাদের ফ্ল্যাটে টবে একটা তুলসীচারা লাগিয়ো।

লরিটা স্টার্ট নিতেই সেই সব দিনগুলো ফিরে এল সদানন্দের কাছে। বিমলা মুখে পান পুরে দরজা ধরে দাঁড়াল, খোকা হাফ প্যান্ট পরে বল নিয়ে দাপাতে দাপাতে চলে গেল মাঠে। জোরে হাঁপ টানলেন সদানন্দ, একদিন মানুষ, পরিজন ধরে রাখতে মাটি ছেড়েছিলেন তিনি। আজ মাটি ধরে রাখতে মানুষ ছাড়লেন তিনি। এত্ত বড় জীবনটায় এই হাপর টানা বুক তবু এই দেহটুকু ছাড়ল না।

অনিন্দিতা গোস্বামী ভারতের ছোটগল্পকার

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

জলছোঁয়া

গোলাম কিবরিয়া পিনু

অনাবৃষ্টির পর জলকষ্টের পর
রজঃকণা ভিজে গেল
মুষলধারায়,
মরুস্থলী উদ্ভিদের মূল জল পেয়ে
গোপন কষ্টবোধ থেকে
পুরিয়া ধানেশ্রী শুনে যেন একা সবলে দাঁড়ায়!

বাদলধারায়
ফিতে খুলে যায়–
পরিস্ফুট হতে থাকে অন্তর্দেশ
লাবণ্যচঞ্চল হয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে
স্লেট পাথরের বেড়াজাল পার হয়ে
জলছোঁয়া আলাদা আবেশ।

শ্রাবণ জুড়ে মায়াবৃষ্টি তুমি

সোহরাব পাশা

সকল শ্রাবণ জুড়ে তুমি মায়াবৃষ্টি
মাঝরাতে পাতা ওড়ে গীতবিতানের

তুমি হাসলে জোছনা ভিজে যায় ঘ্রাণে
ঝরে পড়ে কদমের হলুদ শিশির

ভুল পাঠ কাটাকুটি করে নিরিবিলি
বৃষ্টি তোমাকে তর্জমা করে সারারাত;

ফুল ফোটা শব্দের মত বৃষ্টিলেখা
নক্ষত্রের নীল দ্যুতি বিলি কাটে বুকে,

পৃথিবীর নিবিড় হাওয়ায় দুলে ওঠে
হারানো সুরের গান নিভৃতের বিষাদ সুন্দর

চর্য্যাবালিকার চুল ও ড়ে নাকি ফুল ওড়ে চোখে
জানালায় ভোর খুলে দেখি ছুঁয়ে আছি
তোমার অনিন্দ্য আঙুলের নীল ছায়া

সাহস

কাজী রোজী

কানামাছি খেলতে খেলতে
একজনকে ভীষণ ছুঁতে চাইতাম
পারিনি।

একদিন সাহস করে
তাঁকে ছুঁয়ে ফেললাম
দেখলাম আমি বড় হয়ে গেছি।

একদিন তোমারও সাহস হবে
তুমিও ছুঁতে পারবে।

হায় চিঠি

হালিম আজাদ

এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীতে
কোন ডাকঘর থাকবে না।
চিঠি লেখা ভুলে যাবে মানবজাতি,
যন্ত্রমন্ত্র মোবাইলে কিংবা ল্যাপটপে জানাবে
প্রেমিকা তার আদিঅন্ত কথামালা সুজনের ঠিকানায়।
রূপবান্নরহিম বাদশার মত পুর নো হয়ে যাবে
মায়ের কাছে লেখা সন্তানের চিঠির মর্মার্থ।
দূর দেশ থেকে গোপন বাণী সওয়ার হবে ভিন্ন বাতাসে ভর করে–
এইভাবে একদিন পৃথিবীতে চিঠির জন্মজন ান্বর যাবে মুছে।
মৃত্যু ঘটে যাবে ভালবাসার। নিঃস্ব হয়ে যাবে
ডাকঘর নির্মিতির কাল। মানুষ হবে তখন পাখির সন্তান।
কেচ্ছা হবে চিঠির বাক্স। চিঠির রূপান্তর হবে রূপকথা।
কি ছিল চিঠির
ইতিহাস, কে কবে কার কাছে প্রথম লিখেছিল
এক পয়সার দুরন্ত খামে
সুখদুঃ খের নানা প্রজাতির সমীকরণ, কে কবে
অনন্ত পথের ধুলিতে কাঁধে পাটের বস্তা ঝুলিয়ে ছুটেছিল
গ্রাম থেকে নগরের পথে পথে, কে কবে প্রথম রানার
সেজে হয়েছিল সভ্যতার অমলিন বাহক–
এ সবই ধারণ করবে ঘটিবাটি
কিংবা নদীর উৎপত্তির মত অজানা উপাখ্যান।

একদিন কেউ চিঠি লিখতেই জানবে না। পৃথিবীর রূপ হবে
জঞ্জালের আখড়া।
জিপিও নামের বিশাল
দালানের বুক খালি হয়ে যাবে। তার অন্তর ছিঁড়ে কেবল
হায় হায় ধ্বনি বাজতে থাকবে।
মেঝেতে বসে কেউ আর বণ্টন করবে না লাল্লনীল্লসবুজ র ঙের
পোস্টকার্ড। কান্নাহাসির মন্নমাতা নো পোস্টকার্ড।
পিতামাতার কষ্টের অশ্রু মুছে দেবার অসামান্য পোস্টকার্ড।

জেগে আছ? নীলাঞ্জনা

রাখাল বিশ্বাস

আমার সমস্ত খেলা ভেঙে যায় দীর্ণ খেলাঘরে
আমার সমস্ত গান গানের ভিতরে জ্বলে ওঠে
আমার তৃষিত আঁখি খুঁজে ফেরে সমুদ্রের ঢেউ
আমার আঁধার জীবন পড়ে আছে স্তব্ধ চরাচর
আমার পীড়িত সুখে ছবি আঁকে জ্যোৎস্নার মায়া
আমার স্মৃতির কাছে আলো দেয় প্রথিত জোনাকি
আমার প্রণয়জীবন বাঁক থেকে ফিরে গেছে বাঁকে
আমার গোধূলি রঙে কেঁপে যায় ধূসর পৃথিবী
জেগে আছ? নীলাঞ্জনা, প্রতিৰণে তুমি জেগে থাকো...

রাখাল বিশ্বাস ভারতের কবি

অনেকদিন পর

সুনীল আচার্য

অনেকদিন পর তোমার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।

অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা শোয়ানো,
গালে হাত, কোনও কথা নেই
আমাদের কোলে খেলা করছে ছেলেমানুষ স্মৃতি।
কানায় কানায় জীবনটা যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে
আমি উঠে পড়লাম–
দরজা খুলতে যাব হঠাৎ তুমি বললে
'তোমার সিগারেট?'...

তাকালাম: অ্যাসট্রেটা ভরে গেছে ছাইয়ে!

সুনীল আচার্য ভারতের কবি

তুমি রবীন্দ্রনাথ

দুলাল সরকার

প্রকৃত সঙ্গম মানে কবিতায় আরো বেশি আত্মনিবেদন
পর্যাপ্ত বেদনা, কবিতাবিষয়ক আরো ঝোড়ো হাওয়া
উলোট পালট, তাই ঘোরে থাকা রবি রাতে
ভবতারিণীকে নিয়ে যে সাড়া জাগাতেন তীব্র
কবিতায় নিবেদিত, উত্তেজিত শারীরিক পঙ্‌ক্তিমালা
সঙ্গমের মহৎ কলায় শিল্পিত আবেগে
রূপ রস গন্ধের পর্যাপ্ত ধ্বনি সূর্যের ঔরসজাত
প্রৰিপ্ত ধ্বনির পুঞ্জ নতুন কবিতা হয়ে শিল্পের নতুন উত্থান
বাক্‌ফেরা আবেগের, বাঙালির নয়া রূপায়ণ
কারিগর তুমি রবীন্দ্রনাথ
তোমার লীলায়িত দেহের ভাষায়
যেসব গান ও কবিতা মগ্ন চিত্তের স্বরে ফুটেছিল
শুশ্রূষায়, নান্দনিক দৃশ্যের পটে
জেগে ওঠা সামুদ্রিক নিশীথ উঠোন, শিল্পের কবজ।

প্রতিভোরে আসব

ফাহমিদা আজাদ

যে দিন আমার মৃত্যু হবে,
তোমরা সবাই এসো। এসো
আমার স্বজনদের সমবেদনা জানাতে।
আমাকে শেষ দেখার জন্য,
একবার এসো।
বিছানায় শুয়ে থাকা নিথর দেহটি
তোমরা সাদা কাফনে ঢেকে দিও।
–মৃত্যুর পরেও
পাখি হয়ে–
আমি তোমাদের মাঝে থাকব।

প্রতি ভোরে জানালায় এসে
ঘুম ভাঙানির গান শুনিয়ে
তোমাদের ঘুম থেকে জাগরণ ঘটাব।
কখনো সূর্যের আলো হয়ে
আবার কখনো আকাশের তারা হয়ে
মিটমিট করে জ্বলব।
আমার মৃত্যুর পরেও এভাবে
আমি তোমাদের মাঝে থাকব।

অঙ্গীকার

পঞ্চানন মালাকর

তোমাকে দিলাম ইচ্ছার নীলাকাশ
তোমাকে দিলাম প্রিয় ফুল মলিস্নকা
তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মাঠ।

তোমার শরীরী গন্ধে ভেসেছে রাত
অনতিদূরের গ্রামীণ সে অভিলাষ
তবুও তো তুমি ইচ্ছার নদী ছুঁয়ে
ঢেউ ভেঙে ডাক পাঠাতেই পারলে না।

তোমাকেই দিতে চেয়েছি অনুত্তাপ
নির্জনতায় ভেসে গেছে অবসর
তখনও তো আমি রাখিনি উচ্চারণ
তোমাকে দিলাম আমার অঙ্গীকার।

পঞ্চানন মালাকর ভারতের কবি

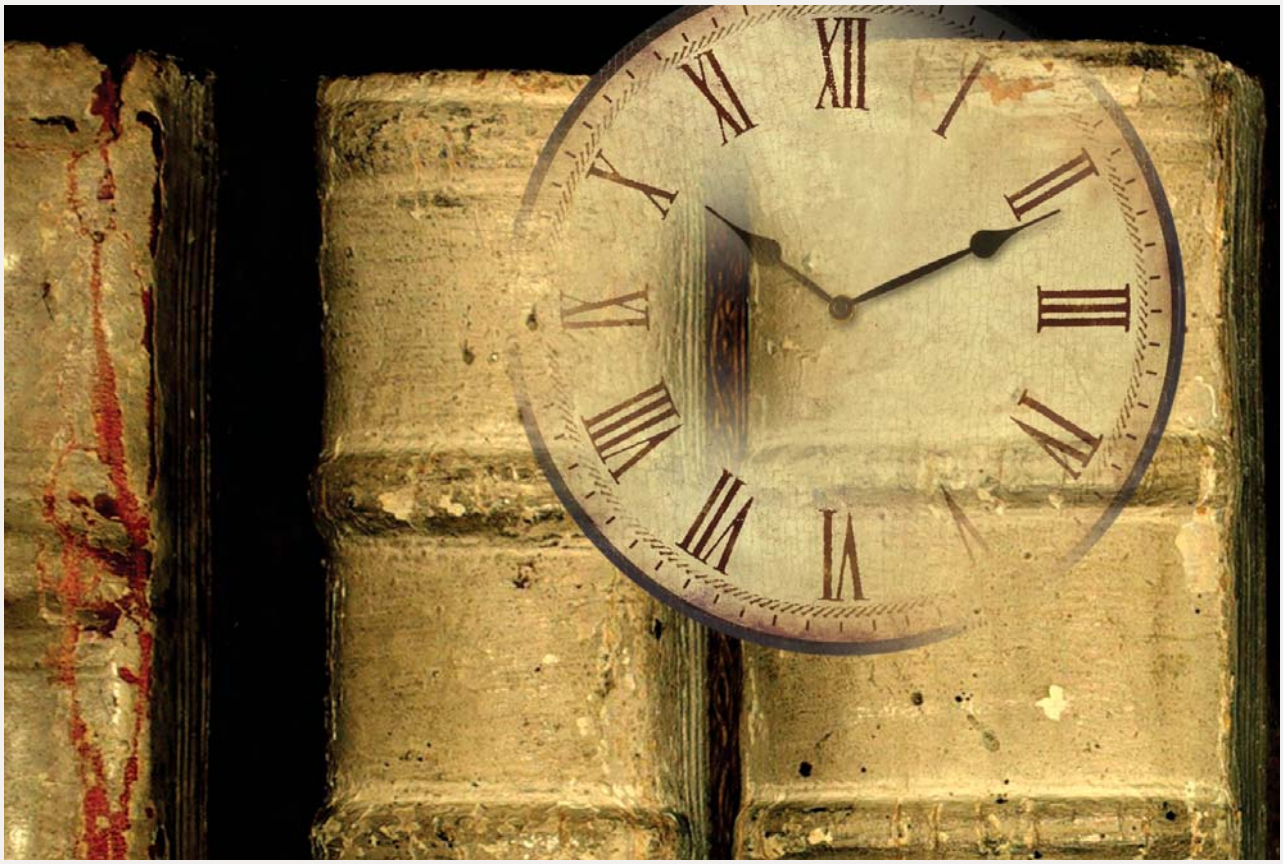

প্রবন্ধ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্প

বৈচিত্র্যের সময়কাল

আদিত্য সেন

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের জন্ম ১৯০৯ সালের ১১ নভেম্বর কলকাতা শহরেই। বাল্যশিক্ষা শুরু হয় কাশীর এ্যাংলোবেঙ্গলি স্কুলে। কলকাতায় ফিরে এসে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গজেন্দ্রকুমার বসবাস শুরু করেন এবং বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। স্কুল জীবন অতিক্রম করে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। স্কুল শিক্ষা সমাপ্তির কিছু পরেই সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *কথাসাহিত্য* বের করতে শুরু করেন। গজেন্দ্রকুমারের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *মনে ছিল আশা*। গল্পগ্রন্থ *স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম*। ১৯৫৯ সালে তাঁর *কলকাতার কাছেই* উপন্যাস একাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। *কলকাতার কাছেই, উপকণ্ঠে, পৌষ-ফাগুনের পালা* এই ট্রিলজিকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের নিশানাচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। *পৌষ-ফাগুনের পালা* ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। গজেন্দ্রকুমারের লেখনীর বিচরণক্ষেত্র বিরাট ও ব্যাপক। সামাজিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোরসাহিত্য সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি। সুদীর্ঘ ষাট বছরের অধিককাল ধরে তাঁর লেখনী সৃজনশীল ছিল। ১৯৯৪ সালের ১৬ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ঋত্বিক পত্রিকায় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তারপরে অসংখ্য গল্প লিখেছেন। লেখার মধ্যে চরিত্র-চিত্রণের অভিনবত্ব থাকলেও গল্পগুলি আধুনিক পরিবর্তিত ধারার পরিচয় বহন করে না। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের মাঝামাঝি ছোটগল্পের যে রূপবদল, উপকরণ ও প্রকরণের অভিনবত্ব ধরা পড়ে, কিংবা গল্পের মধ্যে মনন ও তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবনবোধ– যা অনেক সময় বিমল কর বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি সেটার প্রকাশ হয়তো গজেন্দ্রকুমারের গল্পে অতটা দেখতে পাব না। তবে গল্পগুলির ভাষা ও পরিবেশ সৃষ্টি করার নৈপুণ্য ও চরিত্র-চিত্রণের বিচিত্রতায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

গজেন্দ্রকুমার ছিলেন ক্লান্তিহীন লেখক। সামাজিক উপন্যাস, ছোটদের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি না ধরলেও তিনি অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন– যদিও অসংখ্য গল্প তিনি নিজের হাতে বাতিল করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও শুরুর দিকের নিজের অনেক কবিতা বাতিল করে দিয়েছিলেন– *সঞ্চয়িতা* সংকলনে অনেক কবিতার জায়গা হয়নি। বাতিল করার ব্যাপারটা একালের লেখকদের মধ্যে কতটা কি অবশিষ্ট আছে, তার হিসাব জানা না থাকলেও লেখার মান দেখে অনুমান করা কষ্টকর ব্যাপার নয়। ধারাবাহিক লেখা বা গল্প চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে গল্প লিখে সম্পাদকের দপ্তরে ছোটার মধ্যে ছাপাবার তাগিদটাই আগে চোখে পড়ে, সাহিত্য যে শ্রমসাধ্য তিতিক্ষা– এই মৌলিক শর্ত থেকে আমরা বোধহয় দিনদিন সরে যাচ্ছি। গজেন্দ্রকুমার এত গল্প লিখেছেন বলেই বোধহয় *মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স* ছয় খণ্ডে *কথা কল্পনা কাহিনী* বার করেছেন। ছোটগল্পের প্রথম খণ্ডে প্রকাশক জানিয়েছেন, এতে প্রকাশিত অধিকাংশ গল্পই ইতোপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং নির্বাচনের সময়ও বিভিন্ন রসের বৈচিত্র্যমূলক গল্পগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংকলনের সপ্তম স্তবক পর্যন্ত ২৭১টি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পগুলি যে দেখা জীবনের ছবি, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনিবিন্যাস, তা পড়লেই বোঝা যায়। আধুনিককালে গল্পের নানা ধারা পরিবর্তিত না হলেও তাঁর গল্পে আছে জীবনবোধের সন্ধান, অন্তর্লোকের গোপন রহস্য, ঘটনা-সংস্থাপনের নৈপুণ্য ও গল্পক ল্পনার ব্যাপ্তি। সবচেয়ে যেটা বিস্ময়কর তা হল, এত বিচিত্র জীবনপ্রাঙ্গণের চরিত্র ও ঘটনা এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে কোথাও মনে হয় না বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ঘটেছে। গল্পের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব না ঘটলেই গল্প উৎরে যায়, তার ওপর যদি ঘটনার পরিপাট্য, চরিত্রের বিন্যাস ও সুখদুঃখের তরঙ্গ পেরিয়ে জীবন-তীরে পৌঁছবার ক্ষমতা দেখা যায়, তবে সেই গুণগুলি কোন গল্পকারের উপরি পাওয়া। মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি কিছু উলেখযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করলেও তাঁর লেখক জীবনের প্রধান উপজীব্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের নিখুঁত জীবনছবি। উপন্যাসের তুলনায় মধ্যবিত্তদের বর্ণালু রঙই বেশি উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। যদিও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, দেখেছেন চোরাকারবারী ও কালোবাজারীদের ('রূপকথা' কালোবাজারী নিয়ে একটা উলেখযোগ্য গল্প) ফুলেফেঁপে উঠতে। এই সবই নানা আকারে ও অভিব্যক্তিতে উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। স্বাধীনতাউত্তর ভারতবর্ষ নিয়েও তিনি অনেক গল্প লিখেছেন।

গল্পের বিষয়বস্তুতে যাবার আগে গজেন্দুকুমার মিত্রের আরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

তাঁর উলেখযোগ্য ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাস, *কলকাতার কাছেই* (আগে এই নামে একটি গল্প লিখেছিলেন, পরে উপন্যাস আকারে লিপিবদ্ধ করেন), *উপকণ্ঠে এবং পৌষ-ফাগুনের পালা। কলকাতার কাছেই*-এর জন্য ১৯৫৯ সালে সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৬৪ সালে *পৌষ-ফাগুনের পালা*র জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার ছাড়াও আশি বছরের প্রান্তে এসে পেয়েছেন মোতিলাল পুরস্কার এবং ১৯৯২ সালে শরৎস্মৃতি পুরস্কার।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমসাময়িক লেখকরা বইপত্র পড়ে ভাল লাগলে কিছু বলতেন কিংবা কোথাও না কোথাও তাঁদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে যেতেন। সেদিন চিঠিপত্র আদানপ্রদানের একটা বড় মাধ্যম ছিল। আমরা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্প আলোচনার আগে তাঁর বিষয়ে কে কী বলেছেন, সেটা জেনে নিলে তাঁর সাহিত্যের শ্রেণিবিন্যাস করার ব্যাপারটা সহজ হবে। কঠোর সমালোচক হিসেবে যাঁর বেশ বদনাম ছিল সেই *শনিবারের চিঠি*র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, 'দেখবার চোখ আছে... সাহিত্য ওর পেশা নয়, ওর নেশা। ও জাতসাহিত্যিক...'। ট্রিলজিতে পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের যে কত লাঞ্ছনা ও দূরবস্থা, অন্নসংস্থান করতেই প্রাণান্তকর হাল, সেটাই দেখিয়েছেন লেখক। রাজশেখর বসু অনুযোগ করে বলেছিলেন, 'উমার প্রতি লেখক সুবিচার করেননি।' উমার নির্মম পরিণতি দেখে বলেছিলেন, 'লেখক শেষ খণ্ডেও তার প্রতি দয়া দেখাননি।' আশাপূর্ণা দেবী গজেন্দ্রকুমারের সাহিত্যের খুবই প্রশংসা করে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র *কলকাতার কাছেই* পড়ে বলেছিলেন, 'কোহিনুর হীরে।' ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বলেছিলেন, 'বড় কষ্ট হয় ওঁর লেখা পড়ে।' রাধারানী বলেছেন, 'ওঁর লেখা প্রাত্যহিকতার বাস্তবতায় ঐশ্বর্যবান।' *গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী*র প্রথম খ- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, '...এই উপন্যাসের (*কলকাতার কাছেই*) বাস্তবতা প্রতিদিনের বর্ণরিক্ত অভিজ্ঞতাকেই কেন্দ্র করেছে। লেখক নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে আড়াল করে নিস্পৃহভাবে যে ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের পরিচয় দিয়েছেন, তাকেই যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে লেখক বাংলা উপন্যাসের বিরল পথের পথিক।' পবিত্র সরকার *গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন*এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'লেখক যদি তাঁর কল্পিত ভুবনে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায় ঢেউ খাওয়া, ডুব দেওয়া ও ঘট ভরার সুযোগ করে দিতে পারেন, যদি তাঁর লেখায় প্রতিফলিত জীবনকে আমার সত্য, বিশ্বাস্য অনুভবগম্য বলে মনে হয়, তাহলেই তাঁর রচনার একটা স্বীকারযোগ্য বৈধতা তৈরি হয়ে যায়।...এ বৈধতা তৈরি হয়েছিল গজেন্দ্রকুমার মিত্রের।'

ঋত্বিক পত্রিকায় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তারপরে অসংখ্য গল্প লিখেছেন। লেখার মধ্যে চরিত্রচিত্রণের অভিনবত্ব থাকলেও গল্পগুলি আধুনিক পরিবর্তিত ধারার পরিচয় বহন করে না। পঞ্চাশষাটের দশকের মাঝামাঝি ছোটগল্পের যে রূপবদল, উপকরণ ও প্রকরণের অভিনবত্ব ধরা পড়ে, কিংবা গল্পের মধ্যে মনন ও তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবনবোধ– যা অনেক সময় বিমল কর বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি সেটার প্রকাশ হয়তো গজেন্দ্রকুমারের গল্পে অতটা দেখতে পাব না। তবে গল্পগুলির ভাষা ও পরিবেশ সৃষ্টি করার নৈপুণ্য ও চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

এ আলোচনার প্রথম গল্প 'জনমত'। ভিড় ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই। এর মধ্যে গাড়ি ছাড়ার আগে গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী ভিড় ঠেলে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি ও চেঁচামেচির তুফান উঠল। সাধুজী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে একটা হোল্ডঅলএর বিছানার ওপরে দিব্যি জেঁকে বসে রইলেন। সাধুজীকে লক্ষ্য করে 'সোস্যাল প্যারাসাইট' থেকে শুরম্ন করে কত লোক কত কথা বলল। কিন্তু দেখা গেল কিছুতেই সাধুজীর প্রসন্নতা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। সহ্য শক্তির গুণে এবার দেখা গেল জনমত তাঁর দিকে ঝুঁকেছে। যে লোকটা বাঙ্কে মালপত্র রেখে ঠেলেঠুলে একটু বসবার জায়গা করে নিয়ে সারাক্ষণ

‘ফাউল কাটলেটের ইতিহাস’ গল্পটা ১৯৩৯ সালে লেখা। পরিমল লিলুয়ার রেল কোম্পানির কারখানায় আট বছর কাজ করে। এখন ওর মাইনে বেড়ে হয়েছে একত্রিশ টাকা পাঁচ আনা। সংসারে পাঁচটি পোষ্য, স্ত্রী, চারটি ছেলেমেয়ে, মা আর বিধবা বোন। অবসর পেলেই পরিমল গল্পের বই পড়ে। গল্প পড়ে পড়ে ওরও ইচ্ছে হল চাঙ্গুয়া রেস্টুরেন্টে ও একদিন ফাউল কাটলেট খেতে যাবে। সেখানে ঝকঝকে মেয়ে মিলি মিত্তির ওর সঙ্গে আদর করে কথাবার্তা বলবে। পরিমল সেজেগুজে বেরুতে যাচ্ছে– স্ত্রী এসে বলল, তার নাকি রোজ ঘুষঘুষে জ্বর হয় আবার রাতে ছেড়ে যায়। ছোট ছেলেটা শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তার জন্য একটা সোয়েটার যদি কেনা যেত।

ঘুমোচ্ছিল, পাটনা জংশনে হঠাৎ সে ধড়মড়িয়ে উঠে লোকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেমে পড়ার আগে চিৎকার করে উঠল– আমার স্যুটকেস? সেই আর্তনাদে নিমেষের মধ্যে যাত্রীরা সচকিত হয়ে উঠল। সাধুজীর মাথার কাছেই ছিল স্যুটকেসটা, তবে কি তিনি সেটা নিয়েই নেমে গেলেন? যাত্রীরা মূঢ়ের মত বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে রইল, মুখে তাদের কোন কথা জোগাল না। এই যে নানা পরিস্থিতিতে জনমত কীভাবে পাল্টে যায়, গল্পটার মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। জনমতের সঙ্গে আমরাও কখন যে মাথা নাড়ছি, খেয়াল থাকে না। এইখানেই গল্পটা উৎরে গেছে বলতে হবে। বেশ কয়েক দশক আগে লেখা গল্পটা পড়লে এখনও মনে ছাপ রেখে যায়, সেটাই গল্পের সার্থকতা, আধুনিক কায়দায় লেখা হল কি না সেটা বড় কথা নয়।

আমাদের দ্বিতীয় গল্প ‘আকৃতি ও প্রকৃতি।’ সীতা ও ঊর্মিলা যমজ দুই বোনের যমজ দুই ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। দু’জনেই দু’জনের স্বামী নিয়ে খুশি। তাদের হাসি আনন্দের সংসার। শ্বশুরশা শুড়িকে নিয়েও কারুর কোন হাঙ্গামা নেই। ওদের শাশুড়ি দু’বোনকে সাজস জ্জায় পৃথক করে দিয়েছেন যাতে চিনে নিতে ভুল না হয়। শাড়িগহনা সীতার এক রঙের মেরুন ও পাটকিলে। সবুজ রঙটা ঊর্মিলার পছন্দ সে পরবে সবুজ ও নীল রঙের শাড়ি, কান মাকড়ি আর টব। একদিন ঊর্মিলার শখ হল দিদির দুল ও শাড়ি পরবে। সারা দুপুর– যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন ঊর্মিলা দারুণভাবে সেজেগুজে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজের রূপের নিজেই তারিফ করে। সেদিন বড় ভাই রাম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে বউকে পেস্নজান্ট সারপ্রাইজ দেবে ভেবে। স্ত্রী যে সত্যি সত্যি এত ভাল দেখতে এর আগে এমন করে বোঝেনি। পেছন থেকে গিয়ে ঊর্মিলাকে সবেগে সজোরে বুকে চেপে ধরে উন্মত্ত ও উত্তপ্ত চুম্বনে অভিভূত আচ্ছন্ন করে দিল। ঊর্মিলা বাধা দেবার সুযোগই পায়নি। ব্যাপারটা বাড়িতে হাসি-কৌতুকের মধ্যেই মিটে গেছে।

কিন্তু ঊর্মিলা একা হলেই মন তার অন্যত্র চলে যায়। ভাবে ওর স্বামী লক্ষণই বা এমন স্ৃষ্টিছাড়া রকমের ভাল মানুষ হতে গেল কেন? সে কেন আরও একটু বর্বর গোছের মানুষ হল না! ঊর্মিলা সেদিন বলল, তোমার না বদলির চাকরি, চল না দু’চার মাসের জন্য বদলি হয়ে যাই। স্বামী ভাবল, ও বুঝি পরিবার থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। ঊর্মিলা তার ভুল ভাঙিয়ে বলল, তোমাকে একান্ন করে পেতে চেয়েছি বলে কথাটা বলেছি, পরিবার থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে নয়। লক্ষণ বলে, তুমি একটা আস্ন পাগল। মেয়েদেরও যে নিজস্ব কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনাবাসনা থাক তে পারে, সেটার অভিব্যক্তি গল্পে যেভাবে ফুটে উঠেছে, তখনকার দিনে অনেক লেখকই হয়তো এরকমভাবে লিখতে সাহস করতেন না। এ গল্পের সঙ্গে বিদেশী কোন লেখকের গল্পের তুলনা করলেও মনে হয় মান ও মান্যতায় এ গল্পের কোথায় যেন শ্রেষ্ঠত্ব লুকিয়ে আছে।

এবার ‘বাঁদীর মেয়ে’ গল্পটা একবার নেড়েচেড়ে দেখা যাক। এটা ঐতিহাসিক গল্প। গৌড়ের ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসের মিঞার যখন তিন বছর বয়স, বাপের মৃত্যুর পরে তার মা তাকে প্রাণে বাঁচাতেই এ গ্রামে নিয়ে আসেন। এখানে মসনদ নেই, রাজত্ব নেই, জমিদারীও নেই। খড়ের চালায় এঁরা থাকেন। যদিও তাঁর বিবিরা তাঁকে এখনও শাহজাদা বলে ডাকে। বাঁদির মেয়ে রাবেয়া, নাসের মিঞার সব কাজ করে দেয়, মাঠে ভাত নিয়ে যায় দ্বিপ্রহরে।

শুক্রবার দিন ঘরে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়েন, তার যাবতীয় ব্যবস্থাদি রাবেয়াই করে। সেদিন তাকে দেখতে না পেয়ে বাঁদীর ঘরে গিয়ে জানল সে ভোরবেলা একটা স্বপ্ন দেখেছে যে নাসের মিঞা সুলতান হয়েছেন এবং ফিরে গেছেন। সে কাঁদছে কারণ আর সে কখনও জনাবকে এভাবে তার কাছে পাবে না। সত্যিই একদিন গৌড়ের সিংহাসনে তাঁর ডাক পড়ল। অনেক পীড়াপীড়িতে রাবেয়া সুলতানের সঙ্গে গৌড়ে যেতে রাজি হল বটে, কিন্তু গৌড়ে পৌঁছে যখন রাবেয়ার খোঁজ পড়ল, তখন দেখা গেল সে এতদিন না খেয়ে খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে। আর তাকে বাঁচানো গেল না। ‘বাঁদীর মেয়ে’ উপাখ্যানে যেমন আছে ঘটনাচক্রের আবর্তন, তেমনি এক নির্বিবাদ নির্বিরোধী প্রেম।

‘ফাউল কাটলেটের ইতিহাস’ গল্পটা ১৯৩৯ সালে লেখা। সাদামাটা গল্পটার মধ্যে তিনি গরিবীয়ানার এক অদ্ভুত ট্রাজেডি ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিমল লিলুয়ার রেল কোম্পানির কারখানায় আট বছর কাজ করে। এখন ওর মাইনে বেড়ে হয়েছে একত্রিশ টাকা পাঁচ আনা। সংসারে পাঁচটি পোষ্য, স্ত্রী, চারটি ছেলেমেয়ে, মা আর বিধবা বোন। অবসর পেলেই পরিমল গল্পের বই পড়ে। গল্প পড়ে পড়ে ওরও ইচ্ছে হল চাঙ্গুয়া রেস্টুরেন্টে ও একদিন ফাউল কাটলেট খেতে যাবে। সেখানে ঝকঝকে মেয়ে মিলি মিত্তির ওর সঙ্গে আদর করে কথাবার্তা বলবে। পরিমল সেজেগুজে বেরন্নতে যাচ্ছে– স্ত্রী এসে বলল, তার নাকি রোজ ঘুষঘুষে জ্বর হয় আবার রাতে ছেড়ে যায়। ছোট ছেলেটা শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তার জন্য একটা সোয়েটার যদি কেনা যেত। ডাঁটে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল বটে কিন্তু সবাইকে বঞ্চিত করে ট্যাক্সিতে চড়া, মিটার ওঠে আর পরিমলের বুক কাঁপে। শেষ পর্যন্ন তার আর চাঙ্গুয়ায় যাওয়া হল না। বাড়ি ফেরার সময় বউয়ের জন্য ওষুধ, খোকার সোয়েটার, কোলের মেয়েটার জন্য একটা গরম কাপড়ের ফ্রক আর আধসের বেদানা, মা ও বোনের জন্য নিল ভীম নাগের দোকান থেকে নতুন গুড়ের দুটি সন্দেশ। এত সব জিনিস কিনে উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে পরিমল হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল। গল্পটা পড়ে মনে হয় আমরাও যেন কাটলেট খাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম– এতই মর্মস্পর্শী মানুষের দারিদ্র্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার সংঘাত।

‘যাত্রাসঙ্গিনী’ আমাদের আলোচনার পরের গল্প। রাঘবন কেরালার মানুষ, কলকাতায় থাকতে থাকতে বাঙালিই হয়ে গেছেন। কেরালায় বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন কিন্তু বম্বেতে অফিসের কাজে যেতে হল বলে তাদের আগেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টের সহযাত্রিনী দেখেন একজন শ্বেতাঙ্গিনী। সাজসজ্জা বেঢপ হিপিনী। এসেই ছেলে তিনটেকে বার্থের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। তার মধ্যে বড়টি আরশোলার সুড়সুড়ি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এবং সেই যে শির তেড়া করে রইল আর তাকে বার্থের নীচে ঢোকানো গেল না। চেকার এসে তার ঘাড় ধরে নীচে নামিয়ে দিতে যাবে, তখন তাড়াতাড়ি শ্বেতাঙ্গিনী এসে বাধা দিয়ে বলল– করছেন কি, ও আমার ছেলে। ওপর থেকে রাঘবন সবই দেখছিলেন, বলে দিলেন, আরও দুটি ছেলে বার্থের নীচে লুকিয়ে আছে। তখন টিকেট চেকার দু’জনের হাফ টিকিট না করলে ফাইন করবেন বলে ধমক দিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

আজকাল গল্পকে বলা হচ্ছে সামাজিক দর্পণ। সমাজে যা কিছু ঘটে তার প্রতিফলন গল্প-সমগ্রে। আজকাল সমাজের কোন একটা সময়ের চিত্র ফোটাতে গিয়ে যদি গল্পের ঘটনাকে প্রতিবেদন হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে সেটা থিসিস পেপারেও গ্রহণযোগ্য ঘটনা বা সামাজিক অবস্থার উলেখ্য প্রমাণ বলে গৃহীত হয় বা হচ্ছে। গজেন্দ্রকুমারের 'উপসংহার পর্ব' গল্পে প্রেম করে বিয়ে করার কী পরিণাম, আর দেখেটেকে সম্বন্ধে করে বিয়ের অর্থাৎ পণ-প্রথার পূর্ণ প্রয়োগ ছেলের বাপ-মায়ের কাছে কত মূল্যবান, তারই এক করুণ কাহিনি।

শ্বেতাঙ্গিনী টিকিটের পয়সা বার করলেন। তারপর টিকিট চেকারকে যাবতীয় দুঃখের কাহিনি বলে যেতে থাকলেন, এরা তার নিজের পুত্র নয়, সবাই পোষ্য। ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপিকা হলে কি হবে, এদের তো পুষতে হয়, ফেলে তো আর আসা যায় না, তাই টাকাপয়সার খুব টানাটানি। নিজে সিগারেট ধরিয়ে টিকিট চেকারকে 'অফার' করলেন। সে প্রথমে আপত্তি করল কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীর জোর জবরদস্তিতে সিগারেট ধরাল। পরে ঝোলার থেকে বেরুল মদের শিশি, ছোট গ্লাস ও জল। গ্লাসে ঢেলে মধুর হাসি ছড়িয়ে ও মদির কটাক্ষে টিকিট চেকারের সামনে ধরলেন, সে না করল না। তখন সে টিকিট ক্যানসেল করে অন্যদের থেকে বাঁচতে হলে কী করতে হবে, বুঝিয়ে দিল। নামবার আগে শ্বেতাঙ্গিনী দু'হাতে টিকিট চেকারের গলা জড়িয়ে চুমো খেলেন দু'গালে এবং ঠোঁটেও।

টিকিট চেকার চলে গেলে দেখা গেল মহিলা ছেলেদের ময়লা গেঞ্জি পরিয়ে রেখেছিলেন, এখন তাদের জামা বেরুল। রাঘবন উপর থেকে দেখলেন সামনেই মোটা একশো টাকার নোটের একটা বান্ডিল আর সেই সঙ্গে এক গোছা ট্রাভেলার্স চেক। সব নিয়ে কয়েক হাজার টাকা। গজেন্দ্রকুমারের গল্প বলার মুনশিয়ানা যেমন আছে তেমনি আছে ঘটনার মধ্যে শেষমাখা নো ঠাট্টা।

এবার আমরা দেখাব গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাদামাটা কয়েকটা গল্প, যা চলিশ ও পঞ্চাশের দশকে লেখা– তাও কতটা পাঠককে ধরে রাখতে পারে। একবার ধরলে শেষ করতেই হবে– পাতা উল্টে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের পরবর্তী গল্প 'সাহিত্যিকের মৃত্যু'। অনেকে বলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নিজের জীবনেরই ছাপ আছে এতে। সুকুমার দেশ থেকে মায়ের চিঠিতে জানল বউমার টাইফয়েড, টাকা না পাঠালে বাঁচানো শক্ত। তারপর থেকে সে টাকার ধান্দায় ঘুরছে। অগত্যা উপন্যাসের পা-লিপি নিয়েই নানা পাবলিশার্সের কাছে ঘুরল। নতুন লেখকের উপন্যাস কেউ ছাপতে রাজি নয়। ভূপতিবাবু নামে এক পাবলিশার্সের কথায় সুকুমার উপন্যাসটি একজন উকিলের কাছে ৬০ টাকায় বিক্রি করে দেশে চলে গেল। সেখানে চিকিৎসা করিয়ে বউকে সুস্থ করে কলকাতায় ফিরে এসে দেখে একটি মাসিক পত্রিকায় বিরাট করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে: 'বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস *রজতরশ্মি*– জনপ্রিয় ব্যবহারজীবী শ্রীপতি চৌধুরীর বিস্ময়কর সৃষ্টি।' সমালোচক ও পাঠকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ওর লেখা বই ওর নামে ছাপালে ওকে নিয়েও ধন্য ধন্য পড়ে যেত। এক তীব্র মনঃপীড়ায় ভুগতে থাকে সুকুমার– চারিদিকে *রজতরশ্মির* প্রশংসা। আর সহ্য করতে পারল না সুকুমার। গ্রামে ফিরে গিয়ে বলল, কলকাতা শহরে তার শরীর টিকছে না। গ্রামেই কাজ খুঁজে নেবে।

'জীবন মূল্য' আরেকটি সাদামাটা গল্প। তখনকার কালে মারাত্মক দুটি ব্যাধি ছিল, টাইফয়েড ও টিবি। এই অসুখের শিকার হয়ে কত বাঙালি পরিবার যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার হিসাব নেই। তখনকার লেখকদের মধ্যে এমন বোধহয় কেউ ছিলেন না যাঁরা এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ে বিধ্বস্ত পরিবারের দুঃখের কাহিনি লেখেননি। অবিনাশের পিতা সামান্য একটা চাকরি করতেন। মেসে থাকতেন, বছরে একবার দেশে যেতেন। একটু রেস খেলার অভ্যাস ছিল। হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় দেখা গেল কিছুই তিনি রেখে যাননি বরং একগাদা ধারকর্জ করে গেছেন। অগত্যা স্ত্রী অপর্ণা দুটি ছেলেকে নিয়ে কলকাতার সেই মেসে এসে উঠলেন। মেসের একজনের চেষ্টায় অপর্ণা ছেলেদের নিয়ে বেলেঘাটার একটি বস্তিতে উঠে এলেন। ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। বস্তি ছেড়ে অপর্ণা অন্য ভদ্র পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া করে উঠে এলেন, যদিও ঘরটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এভাবেই অবিনাশের সঙ্গে গলির শেষ বাড়ি নমিতাদের ভাবভালবাস জ ন্মে ওঠে। কিন্তু অবিনাশের টিবি হওয়ায় হাসপাতালে সুস্থ হয়ে এলেও ওই বাড়িতে যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন মেয়েটির বাপের কাছে শুনল নমিতা অন্য এক 'প্রাণের ইয়ারের' সঙ্গে পালিয়েছে। অবিনাশ নমিতাকে গভীরভাবে ভালবাসত কিন্তু ও ভাল করেই জানত ওরা কোন দিকেই নমিতাদের সমান নয়। তবু কী এক দুর্বোধ্য কারণে নমিতাকে খুঁজতে গিয়ে ওর চাকরিবাকরি শরীর সব খোয়াল। কোথায় যেন ভালবাসার সেই আকাঙ্ক্ষাটা লুকিয়ে লিছ। এখন সব কিছু খুইয়ে অবিনাশ বিছানায় পড়ে আছে। ওকে আবার টিবি হাসপাতালে পাঠাবার পর্যন্ত সংস্থান বা অর্থবল নেই।

'আশাতীত সৌভাগ্য'এ দেখানো হয়েছে গরীব ঘরে রূপটাও কত বড় অভিশাপ। ভবেশ রেল অফিসে কাজ করে, কালো, বেঁটে, দেখতে কুৎসিত। তার সঙ্গে বিয়ে হল ময়নার– অপূর্ব সুন্দরী। ঘরে সুন্দরী বউ থাকায় রোজ বন্ধুবা ন্ধবদের আড্ডা জমে ওঠে। ভবেশ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না এত সুন্দরী স্ত্রী তার মত কুৎসিৎ পুরুষকে ঠিক গ্রহণ করতে পারবে কি না। শেষ পর্যন্ত পাড়ার এক সুপুরুষ যুবক, ওদের আড্ডায় এসে বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে রইল। তারপরে যা হতে পারে, তাই হল। কিন্তু ভবেশ তার বউকে সত্যিই ভালবাসে, ওদের সন্তানদেরও দেখে, সঙ্গ দেয়। কিন্তু ওদের ছেলেটি বড় হয়ে অসৎ সঙ্গে যখন মিশতে শুরু করল তখনই গোল বাধল। নন্দিনীকে ভালবাসে সেটা জানাজানি হওয়াতে অতটা আপত্তি ওঠেনি। যখন জানা গেল ময়নার ছেলেটার কাছে নন্দিনীর চেয়ে তার মায়ের সাহচর্যই কাম্য– অথচ নন্দিনীর মা বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়– তখন ময়না আপত্তি করল। ছেলে মাকে শুনিয়ে বলে, 'এ নিয়ে এত কা- করার কি আছে মা, আমার পক্ষে তো এইটেই স্বাভাবিক।... আমি তো তোমাদেরই ছেলে।' তখন থেকে ময়নার অন্তর্ধান হয়েছে। ভবেশ রোজ ভাবে স্ত্রী ফিরে আসবে। সেই ক্ষীণ আশায় সে রোজই একবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ায়।

আজকাল গল্পকে বলা হচ্ছে সামাজিক দর্পণ। সমাজে যা কিছু ঘটে তার প্রতিফলন গল্পসমগ্রে। আজকাল সমাজের কোন একটা সময়ের চিত্র ফোটাতে গিয়ে যদি গল্পের ঘটনাকে প্রতিবেদন হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে সেটা থিসিস পেপারেও গ্রহণযোগ্য ঘটনা বা সামাজিক অবস্থার উলেখ্য প্রমাণ বলে গৃহীত হয় বা হচ্ছে। গজেন্দ্রকুমারের 'উপসংহার পর্ব' গল্পে (এটা সপ্তম স্তবকের শেষ গল্প) প্রেম করে বিয়ে করার কী পরিণাম, আর দেখেটেকে সম্বন্ধে করে বিয়ের অর্থাৎ পণপ্র থার পূর্ণ প্রয়োগ ছেলের বাপমা য়ের কাছে কত মূল্যবান, তারই এক করুণ কাহিনি। ভূপতিবাবু দুই ছেলের একই দিনে বিয়ে দিচ্ছেন। ভূপতিবাবুদের রানাঘাটে বাড়ি, যেটা আজ আর গ্রাম নেই, উদ্বাস্তুদের কল্যাণে রীতিমত জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছে। বড় ছেলে করছে 'লাভ ম্যারেজ', তাতে ভূপতিবাবুর একেবারে সম্মতি নেই এবং তিনি এ বিয়ে মেনে নিয়েছেন ছেলেকে শান্তি দেবেন বলে, কারণ সে কোনরকম যৌতুক নেবার বিপক্ষে। বড় ছেলে

বাংলা ছোটগল্প সাহিত্য-সীমান্তের অনেকটা পথ পরিক্রমা করে এসেছে। এ পরিধির মাপ যত বাড়ে তত ভাল। একসময় মাস্টার-ছাত্রীর প্রেম নিয়ে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের অনেকে হাত পাকিয়েছেন। পরবর্তীকালে শহুরে প্রেমের বিচিত্ররূপ। নানা শহুরে সমস্যা, দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদ-বিষাদ-একাকিত্ব, বাইরের উঠোনের অন্ধকার থেকে মননের অন্তর্গূঢ় করিডোর পর্যন্ত গল্পের হাত প্রসারিত। তারপর একসময় ফ্ল্যাটে থাকা নিউক্লিয়ার ফ্যামেলি ও তাদের সমস্যা, মা ও সন্তানদের পড়াশুনা সিলেবাস ও প্রচণ্ড পড়াশুনার চাপ সৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর পরিণাম।

গল্প বিভিন্ন সময়ে নানা আকার ও নানা রূপ নিলেও মাঝে মাঝে মনে হয়, চলিশ-পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের লেখকদের কিছু কিছু ক্লাসিক গল্প যেন এখনও পড়তে বেশ ভাল লাগে। মনকে নাড়া দেয়। আন্তরিকভাবে জীবনকে অনুশীলন করে দেখার ফলশ্রুতি বলেই বোধ হয়। গজেন্দ্রকুমারের 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম' সেরকম একটি উৎকৃষ্ট গল্প। অব্যক্ত, চাপা সুসংবদ্ধ হৃদয়-ছোঁয়া এক দুরূহ প্রেম, বোঝা যায় আবার যায়ও না।

এমএ পাশ, রানাঘাটে একটা কলেজে পড়ায়। ছোট ছেলে সরকারি চাকরে, ভূপতিবাবুর ধারণা ও অনেক রোজগার করে। বড় ছেলের বিয়েতে তিনি কিছুই করেননি, যত ধুমধাম ছোট ছেলে ও বউকে নিয়ে। দু'ভাইয়ের বিয়ে অথচ একজনের নেমন্তন্ন কার্ড ছাপানো হয়েছে। বউভাতের রিসেপশন সব ছোটবউকে নিয়ে, বড়বউ অবহেলায় অনাদৃতভাবে ঘরের এক কোণে পড়ে রইল। কেউ তার কাছে গেল না, কেউ তাকে কাছে ডাকলও না। বড় ছেলেকে শাস্তি দিতে গিয়ে বাপ প্রথমেই একটা আঘাত পেলেন নিমন্ত্রিতদের খাবার কম পড়ে যাওয়ায়। বাবার বিপন্ন অবস্থা দেখে বড় ছেলেই টাকা দিয়ে অতিরিক্ত খাবার কিনে এনে পিতার মান বাঁচায়।

এসব দেখে ছোটবউ শুধু যে বিস্মিত ও অনুতপ্ত তাই নয়, এ অভব্য পরিবারে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে একটা চিঠিতে লিখল, আপনারা আপনাদের বড়বউয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, তা আমি ভাবতে পারি না। এই পরিবারে বউ হিসেবে জীবন কাটাতে হবে, সে কথা মনে হলেও আমার ঘৃণা হয়। আমি চললাম। বলে সে বাপের বাড়ি চলে গেল। চিঠি পড়ে ভূপতিবাবু শুধু আক্ষেপ করলেন বড়বউ যে চাকরি করে হাজার টাকার মত রোজগার করে তা তো খোকা একবারও বলেনি। টাকাটাকে মানদ- হিসেবে দেখে ব্যবহারিক জীবনে বৈষম্য খুব জোরালভাবে প্রকাশ করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। দেখিয়েছেন মানুষের লোভ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ভদ্রতার মুখোশটুকু পর্যন্ত নেই।

বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যসীমা ন্তের অনেকটা পথ পরিক্রমা করে এসেছে। এ পরিধির মাপ যত বাড়ে তত ভাল। একসময় মাস্টারছা ত্রীর প্রেম নিয়ে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের অনেকে হাত পাকিয়েছেন। পরবর্তীকালে শহুরে প্রেমের বিচিত্ররূপ। নানা শহুরে সমস্যা, দ্বন্দ্ববি চ্ছেদ-বিষাদএকাকিত্ব, বাইরের উঠোনের অন্ধকার থেকে মননের অন্তর্গূঢ় করিডোর পর্যন্ত গল্পের হাত প্রসারিত। তারপর একসময় ফ্ল্যাটে থাকা নিউক্লিয়ার ফ্যামেলি ও তাদের সমস্যা, মা ও সন্তানদের পড়াশুনা সিলেবাস ও প্রচ-পড়াশুনার চাপ সৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর পরিণাম। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল গ্রাম থেকে শহরে যাবার আন্দোলনের পশ্চাৎপটে গল্প, পরবর্তীকালে হিংসা-দ্বেষমারামারিখুন-জখমের মধ্য দিয়ে বাম আন্দোলন থেকে অতিবাম পর্যায়ের আন্দোলনের রূপান্তর ও বিশ্বাসঘাতকতা, তা নিয়ে গল্প লেখার আবেগ। গল্প লেখার হিড়িক পড়ল মৃত্যু, হত্যা ও রাজনীতি নিয়ে। জোতদার, অপারেশন বর্গা, ভূমিসং স্কার, পঞ্চায়েত, গ্রামের নানা রূপ, ব্যতিক্রমী প্রেমের নানা ছবি। কৃষক হাটবাজার গ্রামীণ প্রেমউপাখ্যানের কাহিনি– আবার হিংসা ও রাজনীতির গা ছুঁয়ে শহুরে আক্রমণের নানা বিচিত্র গল্পগাথা।

গল্প বিভিন্ন সময়ে নানা আকার ও নানা রূপ নিলেও মাঝে মাঝে মনে হয়, চলিশপ ঞ্চাশ ও ষাটের দশকের লেখকদের কিছু কিছু ক্লাসিক গল্প যেন এখনও পড়তে বেশ ভাল লাগে। মনকে নাড়া দেয়। আন্তরিকভাবে জীবনকে অনুশীলন করে দেখার ফলশ্রুতি বলেই বোধ হয়। গজেন্দ্রকুমারের 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম' সেরকম একটি উৎকৃষ্ট গল্প। অব্যক্ত, চাপা সুসংবদ্ধ হৃদয়-ছোঁয়া এক দুরূহ প্রেম, বোঝা যায় আবার যায়ও না। তখন মনে হয় মেয়েদের মন বোঝা সত্যিই বোধহয় দুরূহ। প্রেমের গভীরতা বোধহয় তারাই বেশি অনুভব করে, তাই তাদের বাহ্যিক ব্যবহারের ভেতরে সুপ্ত থাকে যে প্রেমকণা, তা যে কখন শুকিয়ে যায়, আবার কার প্ররোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত– সেই দোলাচল নিয়েই এ গল্প।

গ্রামের খেয়াঘাটের ওপর সর্বেশ্বরের পরোটার দোকান। খুব বিক্রি। সাতসকাল থেকে রাত অবধি। সাতসকালে সর্বেশ্বর কাশীনাথকে দোকানে বসে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হল। জিজ্ঞাসা করে জানল কাল কিসের একটা হরতাল ছিল, সেটা ভুলে গিয়েছিল বলে কাশীনাথ সারারাত উপোস দিয়েছে, কারণ দেশের নেতারা সারা দেশের কথা ভেবেই না কাজ করেন! কিন্তু চা আর তার খাওয়া হল না। দাশুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে কিছু না খেয়ে সোজা গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সর্বেশ্বর দাশুকে বকা দিল, কেন যে সে পাগল মানুষটার পেছনে লাগতে যায়।

স্টেশনের পোর্টার নন্দ বৈরাগীর বাড়িতে কাশীনাথ থাকে। নন্দগিন্নি পারন্নল তাকে খুব যত্ন করে। দু'জনের মধ্যে অনেক মিষ্টিমধুর কথাবার্তা হয়। পারুল তাকে ছোটবাবু বলে ডাকে, দেশের জন্য এত মন তার। ঘর ছেড়ে এসেছে ওই কারণে। সেজন্য পারুল তাকে একটু যেন সমীহ করে চলে। এই শীতে ভোর বেলাতেই নেয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কাশীনাথ মাথা চুলকে জবাব দিল, 'এমনিই। দাশুর সঙ্গে রাগারাগি করে গঙ্গায় নেমে গেলুম।' পারুল হেসে জানতে চায় দাশুর সঙ্গে রাগারাগিটা আবার কিসের, গান্ধী না সুভাষ বোস? কাশীনাথের কৃপায় এ নামগুলি এদের সকলের বেশ কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাশীনাথ রাগ করে বলে, 'দ্যাখো বউ, খবরদার ওদের নাম নিয়ে ঠাট্টা কোরো না বলে দিলাম। জিভ খসে পড়বে।' পারুল আর কথা না বাড়িয়ে ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে গঙ্গাস্নান করে এসে দেখে ছোটবাবু তার জন্য চা বানিয়ে রেখেছে। দেখে ওর খুশি উপচে পড়ে। এভাবে আস্তে আস্তে দু'জনের মধ্যে ভাবভালবাসা গ ড়ে ওঠে। পারুল ছোটবাবুকে অত যে ভালবাসে, যত্ন করে খাওয়ায় তার প্রকাশ কিন্তু অতটা নেই। কাশীনাথ ওদের সঙ্গে আছে বলেই ওর পয়সায় সংসারটাও একটু ভালভাবে চলছে। তা সত্ত্বেও পারুল হঠাৎ কেন ছোটবাবুর বিয়ের জন্য এতটা পাগল হয়ে উঠল, তা বোঝা দায়। ওর স্বামী নন্দ বাধা দেবার চেষ্টা করে বলেছিল, বউ নিয়ে কাশীনাথ যদি আলদা বাসা করে চলে যায়, তখন তাদের কি অবস্থা হবে? কিন্তু পারুল যা

বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় কাশীনাথ যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সেটা পারুলের কোথায় গিয়ে আঘাত দিয়েছে তা বোঝা গেল পরবর্তী নাটকে। ভোরবেলা উঠে একখানা ফর্সা কাপড়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিয়ে কাশীনাথের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, এক্ষুনি তার সঙ্গে মনোহরপুর যেতে হবে। কাশীনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার কি যাওয়া ভাল দেখাবে বউ?' পারুল অসহিষ্ণু হয়ে বলল– 'কাল তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। ঠাট্টা বোঝ না? যাও, ওঠো...। এক্ষুনি না গেলে ফিরতে বড় দেরি হয়ে যাবে।' রমণী চরিত্র বোঝা সত্যিই দুরূহ।

একবার ভাবে, তা তার করা চাই।

ছোটবাবুকে নিয়ে দূর গ্রাম মনোহরপুরে তার সইয়ের বাড়িতে গেল। সইয়ের একটি মিষ্টি মেয়ে আছে, ছোটবাবুর যদি পছন্দ হয়। ছোটবাবু জেদ করে একটা জামা পরে কাঁধে একটা গামছা ফেলে চলল, খালি পা। কাশীনাথ দেশের কথা ভেবে কৃচ্ছসাধন করতে চায়, জুতো পরার কথা বলায় সে বউকে বলে, আমাদের দেশের কত লোকের গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত জোটে না। আর জুতো তো কোন ছার। কিন্তু পারুলের অনেক পীড়াপীড়িতে সে জুতো পরলেও বাড়ির ভেতরে যাবে না, কোনকিছু খাবে না, আর জোর করলে ফিরে আসবে। এই শর্তে সে গিয়ে দাওয়ায় গামছাটা বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এবার লেখকের নিজস্ব ভাষায় গল্পে বর্ণিত পরিস্থিতিটা দেখা যাক:

"কাশীনাথ চোখ মেলিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, একটি বছর চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী মেয়ে মাদুর হাতে করিয়া তাহাকেই ডাকিতেছে। এইসব ব্যাপারের ভয়েই সে আসিতে চায় নাই, অত্যন্ত বিরক্ত মুখে কহিল, 'না, আমি বেশ আছি।'

মেয়েটিও ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'মাদুরটা পেতে দিলেই কি খারাপ থাকবেন?'

কাশীনাথ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না না, ওসব আমি ভালবাসি না–'

মেয়েটি মাদুরটা বিছাইতে বিছাইতে ফোড়ন কাটিয়া কহিল, 'তা হোক– তবু সব মানুষই তো আমাদের ভাই-বোন, আমাদেরও উচিত তাদের যত্ন করা। আমরা চুপ করে থাকি কি করে বলুন?'..."

মেয়েটি প্রতিটি কাজে বারবার আসে এক একটি বায়না নিয়ে। সবই বউয়ের চালাকি বলে একবার উঠে পড়েছিল, কিন্তু পারুলের কাকুতিমিনতিতে ভেতরে গেল। পরে মেয়েটির সেবাযত্নে ছোটবাবু এত মজে গেল যে পারন্মল তা দেখে, আবার বিস্মিত হল, বেশ একটু কষ্টও পেল। ফেরার পথে অন্ধকারে নির্জন পথে আমগাছ ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে ভয় করছে বলায় ছোটবাবু তার হাতটা ধরেছিল। পারুল তখন যেন বেঁচে গেল, কাশীনাথের হাতটা চেপে ধরে বলল, 'বাঁচলুম, যা ভয় হচ্ছিল আমার।'

দিনতি নেক পরে কাশীনাথ জানতে চাইল বউ তার সইয়ের বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে কি না। মিছিমিছি তারা অপেক্ষা করে থাকবে। বউ যেন জানিয়ে দেয় সে বিয়ে করবে না। মেয়েটিকে তার খুবই পছন্দ হলেও মুখ ফুটে বলতে লজ্জা। পারুল তা আন্দাজ করেই নানা কথা বলে ছোটবাবুকে যাচাই করে নিচ্ছিল। কাশীনাথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা বলতে চাইছে তা হল এই যে, যার চালচু লো নেই আর যাকে দেশের কাজ করতে হবে, এরকম একটা হতভাগাকে ধরে-বেঁধে বিয়ে না দিলেই কি নয়! পারুল বাধা দিয়ে বলতে চেয়েছিল, যারা দেশের কাজ করে তারা কি কেউ বিয়ে করে না?

পরের দিন পারুল অনেক রাত পর্যন্ত ছোটবাবুর জন্য বসে রইল। কাশীনাথ এসে বলল সে খেয়ে এসেছে। জেরা করতেই বেরিয়ে এল যে কাশীনাথ নাকি তার সইয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে জোর করে ধরে নিয়ে রাতে খাইয়ে তবে ছেড়েছে। যখন শুনল সইয়ের বাড়িতে গিয়ে ছোটবাবু খেয়ে এসেছে তখন ঠিক করল এ বিয়ে হতে দেবে না। টগরের মা এসেছিল বউকে বলতে যে অনেকটা তো এগিয়েছে, এখন শেষ রক্ষা যদি সই করে দেয়। হঠাৎ তার ভীষণ ঘৃণা হল কিংবা রাগ কে জানে! পারন্মল এ বিয়ে ভেঙে দেবার জন্য কায়দা করে বলল, টগর যদি তার মেয়ে হত তাহলে ও পাত্রতে ও কিছুতেই বিয়ে দিত না। এদিকে ছোটবাবুকে পারুল বানিয়ে বলল, সে এসেই ছোটবাবুর নামে এমন কতগুলো মন্দ বলেছিল যে পারুল বলতে বাধ্য হয়েছে তার মেয়ের সঙ্গে এ বিয়ে দেবার চেষ্টা যেন সই না করে।

এবার আবার লেখকের বয়ানে:

'এ ক্ষীণ কেরোসিনের আলো, কিন্তু তাহাতেই কাশীনাথ যে কত বড় আঘাত পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারুলের বিলম্ব হইল না। কাশীনাথ ভাতের থালাতে হাত রাখিয়াই কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।'

বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় কাশীনাথ যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সেটা পারুলের কোথায় গিয়ে আঘাত দিয়েছে তা বোঝা গেল পরবর্তী নাটকে। সেদিন পারুল রাতে খায়নি, ঘুমাতেও পারেনি সারারাত। ভোরবেলা উঠে একখানা ফর্সা কাপড়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিয়ে কাশীনাথের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, এক্ষুনি তার সঙ্গে মনোহরপুর যেতে হবে। কাশীনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার কি যাওয়া ভাল দেখাবে বউ?' পারুল অসহিষ্ণু হয়ে বলল– 'কাল তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। ঠাট্টা বোঝ না? যাও, ওঠো...। এক্ষুনি না গেলে ফিরতে বড় দেরি হয়ে যাবে।' রমণী চরিত্র বোঝা সত্যিই দুরূহ।

অনেকে বলেন প্রায় দুশো খানা বই লিখে গজেন্দ্রকুমার মিত্র কি সামগ্রিক সাহিত্য কীর্তির মান রক্ষা করতে পেরেছেন? বাস্তবিক একদিকে বইয়ের ব্যবসা, অন্য দিকে লেখার মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা– এই দুই প্রান্ন্বে দাঁড়িয়ে তিনি এত লিখলেন কী করে? অথচ যা লিখেছেন তার মধ্যে ফুটে উঠেছে সাহিত্যের প্রতি তাঁর পরম নিষ্ঠা ও শিল্প-নৈপুণ্য। গল্পের মধ্যে বিষয়বস্তুর উপকরণ বিচিত্রতার ভাণ্ডার। বোঝা যায়, তিনি সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে অসংখ্য মানুষ দেখেছেন, অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিশেছেন এবং মানুষের সুখদুঃখ ও জীবনধার ণের বিচিত্রতাই তাঁর গল্পের আধার ও প্রাণ। মাঝে মাঝে দু'একটা গল্প উঠে আসে সময়ের প্রতীক হয়ে। বাস্তবিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পগুলির মধ্যে একটা বিগত কাল যেন নানা সমস্যা ও সংকট নিয়ে মুখর হয়ে আছে!

আদিত্য সেন ভারতের প্রাবন্ধিক

অনেকে বলেন প্রায় দুশো খানা বই লিখে গজেন্দ্রকুমার মিত্র কি সামগ্রিক সাহিত্য কীর্তির মান রক্ষা করতে পেরেছেন? বাস্তবিক একদিকে বইয়ের ব্যবসা, অন্য দিকে লেখার মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা– এই দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি এত লিখলেন কী করে? অথচ যা লিখেছেন তার মধ্যে ফুটে উঠেছে সাহিত্যের প্রতি তাঁর পরম নিষ্ঠা ও শিল্প-নৈপুণ্য। গল্পের মধ্যে বিষয়বস্তুর উপকরণ বিচিত্রতার ভাণ্ডার।

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

আব্বা ওর দিকে তাকিয়ে বলেন – বেশ দেখাচ্ছে। রেডি?

ঘাড় নেড়ে মৌটুসি জানায় ও রেডি। আব্বা বলেন– সবসময় ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। একা কোথাও যাবে না। মেলায় ভিড় হয় খুব। সাবধান। বলেই আটআনা দেন ওকে। দুই টাকা? যেন দুই লাখ টাকা পেয়েছে ও এত খুশি। জীবনে ওকে কেউ এত টাকা দেয়নি। আব্বার বন্ধু বলেন– ভয় পাবেন না কবি সাহেব। আমি আছি না? আমি তো আর আপনার মত কবিতা লিখি না।

আব্বা বলেন–সে তো জানিই। তবে আপনি দার্শনিক মানুষ। তাই।

এই পাগল দার্শনিক বন্ধুর প্রতি আব্বার যে খুব বিশ্বাস আছে মনে হয় না। আব্বা বলেন– কাজলা সারাৰণ ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।

তিনি অবশ্য রিকশায় উঠে আব্বার কবিতার কথা বলেন। তাঁর কবিতা ভাল লাগে। আব্বার কবিতা তাঁর বেশ প্রিয়। আরো নানা গল্প করতে করতে ওরা একসময় মেলায় চলে আসে। তিনি বলছিলেন– তোমার মত আমার কোন মেয়ে নেই। তিন তিনটে ডানপিটে ছেলে আছে। তুমি যখন আর একটু বড় হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়বে। তাঁর কবিতা, ছড়া। আর একটু বড় হলে গল্প।

আমি জানি 'বীরপুরুষ' আর 'আমাদের ছোট নদী'। মৌটুসি বলে।

আরো জানবে। কবিতা ছড়া গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এবং আরো নানা কিছু। আসলে আমার ঈশ্বর উনি। তিনি বলছিলেন– যে ঈশ্বর থাকে বুকের ভেতরে সেই সবচেয়ে বড় ঈশ্বর। ওঁকে আমি সারাৰণ আমার বুকের ভেতরে পাই।

আমার ঈশ্বর আকাশে থাকে। বলেছিল মৌটুসি।

তিনি হেসেছিলেন ওর কথায়। এখন ওর মনে হচ্ছে কী করবে ও এত টাকা দিয়ে। বাড়ির জন্য গরম জিলাপি, বেতের খালুই কিনবে নিজের জন্য– যখন মাছ ধরা পড়বে সেগুলো ওখানে রাখবে। সবগুলো মাছকে তো আর ভালবেসে পানিতে ফেলে দিতে পারে না। মায়ের জন্য কুলা, ছোট কাঠা আর চাঙারি। মিঠুপার নকুলদানা আর আচার। আর কিছু কিনবে পরদিন ও আর পরী মিলে সেগুলো খাবে বলে। যদি পরাণ আসে ওকেও ভাগ দেবে। বাতাসা কিনবে আব্বার জন্য। উনি বাতাসা খেয়ে পানি খেতে ভালবাসেন।

তিনি বলেছিলেন– বড় হয়ে কী হতে চাও?

এয়ারহোস্টেস। একটুও চিন্ত্বা না করে বলেছিল ও।

ও আকাশে উড়তে বুঝি তোমার খুব শখ?

খুব।

হয়তো একদিন মত বদলে যাবে তোমার। মৌটুসি বুঝতে পেরেছিলেন মৌটুসির সঙ্গে ঘুরতে তাঁরও ভাল লাগছে।

মেলায় গিজ গিজ মানুষ। পাগলচাচা ওর হাত ধরে আছেন। অবশ্য মৌটুসি কখনো তাঁর সামনে এমন নামে ডাকে না। তবে দুইবোন যখন এই চাচার কথা বলে, বলে– ও পাগলচাচা!

মাকড়সা কন্যার সামনে এসে মনে হয়– আহারে পা কোথায় তোমার? চিরদিন ও মাকড়সাকন্যার এই দুর্দশা নিয়ে ভেবেছে। কেমন করে ও মাকড়সাকন্যা হল ভাবতে ভাবতে ও কোন কূলকিনারা পায়নি। নিজের দুই সুস্থ সবল পা-কে ও আরো বেশি ভালবেসেছে। বলে– চাচা ও কেন হাঁটতে পারে না?

না। আসলে লোকজন কায়দা করে ওর পা দুটোকে অদৃশ্য করে পয়সা রোজগার করছে।

চাচা ওকে আলুর চপ আর চা খাওয়ান। তিনি চা খেতে খেতে বলেন– তুমি তাহলে এয়ারহোস্টেস হবে?

জ্বি চাচা।

খুব ভাল লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে মেয়ে।

ও যে ভাল করে কথা বলে এই প্রথম শুনল ও। মিঠুপা বলেন– চ্যাটারবক্স। মা বলেন হড়বড়ি ছটফটি। আব্বা বলেন– গুলটি মা। ও কী করবে গোল হয়ে গেলে? ওর যে খেতে ভাল লাগে। ও রোজা রাখতে পারে না। অল্প সময়ের ভেতরে না খেলে ওর মাথা ঘুরতে থাকে। এখন ও আর চাচা চা খায়, চপ খায়, বুন্দিয়া খায়। ইস কি যে ভাল এগুলো। ওর খাওয়া চেয়ে দেখেন তিনি। নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছিয়ে দেন। চারপাশের সকলে খুশি। একেই বলে মেলা। সকলেই ঝলমল মুখে ঘুরছে। নাগরদোলা, এরপর আছে হাতের রেখা দেখানো, বানরের নাচ আরো কত কী।

ওরা এবার ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একজন প্রিয়-পরিচিতের দেখা পান। কথায় ডুবে যান। ভুলে গেছেন মৌটুসির কথা। হাতে ডুগডুগি বাজিয়ে এক বানরওয়ালা চলেছে বানরের খেলা দেখাতে। মৌটুসিও সে দৃশ্যে ভুলে গেছে বাবার সতর্কবাণী। সবসময় চাচার হাত ধরে চলবে। যখন বানরের খেলা শেষ হয় আকাশে কালো কালো মেঘ। বিষ্টি পড়তে শুরম্ন করে মুহূর্তে। সারা মেলা অন্ধকার। সন্ধ্যার কালো আর আকাশের কালো সব মিলে মৌটুসি বুঝতে পারে না ও কী করবে। মেলায় পাওয়ার কাট। কিছু দেখা যায় না। মেলা থেকে কোনমতে বাইরে আসে ও। আকাশ ফুটো হয়ে অবিরল ধারায় বর্ষা তখন মৌটুসির শরীরে, মাথায় চোখে মুখে। মুষলধারে বৃষ্টি মানে হাতুড়ির মত বড় বড় ফোঁটা। একটি বড় বটগাছের নিচে মৌটুসি একা। ওর চুল, জামা ভিজে একসা। হাতের খাবারের প্যাকেট সব একসঙ্গে দলা পাকিয়ে গেছে যা দিয়ে সরবৎ ছাড়া আর কিছু হবে না। কড় কড় কড়াৎ। বাজ পড়ছে কোথায়? মাথার উপরের ডালে কিসের নাচ ও বুঝতে পারে না। কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছে তাও বুঝতে পারে না। মৌটুসি কাঁদে আকুল হয়ে আর ওর ভাবনায় যে আলস্নাহ থাকে আকাশে তাকেও ডাকতে থাকে। আলস্নাহ আলস্নাহ করতে করতে ও যখন ভয়ের শেষসীমায়– মনে হয় কে যেন এসে ওর পাশে দাঁড়াল। সেই অপরিচিত মানুষ বলে– কি ব্যাপার খুকি তুমি কী পথ হারিয়ে ফেলেছ?

কাঁদতে কাঁদতে ও বলে– আমি বাড়ি যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি।

লোকটি ওর ঠিকানা জেনে নেয়। বলে– চল আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমিও ওদিকে থাকি। মৌটুসির হাত ধরে লোকটা। অচেনা মানুষের হাত ধরে অন্ধকারে ও হাঁটতে থাকে। একটা বাজ পড়ে যেন কোথায়। লোকটা বলে– ভয় পাবে না। আমি আছি না।

একসময় ও বুঝতে পারে বাড়ির সামনে এসে গেছে।

বাড়ি দেখতে পেয়ে ও এতৰণ পর খুশিতে কেঁদে ফেলে। কড়া নাড়তেই একসঙ্গে সব মানুষ ছুটে আসে। মনে হয় ওরা সকলেই দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিল। বাবা পাগলচাচা ওকে খুঁজতে তখনই বের হবেন বলে ঠিক করেছেন।

কোথায় ছিলে তুমি? কার সাথে এলে? পাগলচাচা প্রথমেই এমন প্রশ্ন করেন।

ওই যে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে। এই বলে মৌটুসি পেছনে তাকায়। কিন্তু তখন পেছনে কেউ নেই। মৌটুসি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এবং আর সকলে। কড় কড় কড়াৎ বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে এবং সেই আলোতে বড় রাস্তার শেষপর্যন্ত দেখা যায় কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

কোথায় মানুষ। কেউ নেই তো? মিঠুপা বলেন– একা এসেছিস সে কথা বলতে এত ভয় কেন?

আমি একা আসিনি। মৌটুসি প্রতিবাদ করে।

বাবা বলেন– থাক থাক কার সঙ্গে এসেছে সেটা বড় কথা নয়। এসে গেছে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

হয়তো তুমি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে আছি তাই না মামণি?

এদের কারো কোন কথার উত্তর না দিয়ে শপশপে ভিজে জামায় মৌটুসি বাড়ির ভেতরে যায়।

মা চুল ও শরীর মোছান। ভেজা কাপড় খুলে পরিষ্কার প্যান্ট জামা এনে সামনে রাখেন। মৌটুসি মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে বলে– ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না মা। তিনি বলেন– তাঁকে তো দেখা গেল না। মুহূর্তে কোথায় চলে গেলেন তিনি। আমাদের ধন্যবাদ নেবার জন্যও দাঁড়ালেন না। কে সেই লোকরে মৌটুসি?

আমি জানি না। আমি বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিলাম– উনি তখন পাশে এসে দাঁড়ান।

আর কী করছিলে তখন?

তুমি বলেছ না ভয় পেলে আলাহকে ডাকতে হয়। কাঁদতে কাঁদতে আলাহকে ডাকছিলাম।

মা ওর ভেজা চুল আঁচড়ানো থামিয়ে বুকের ভেতর টেনে নেন। –তুমি আলাহকে ডাকছিলে তো তাই আলাহ কোন এক ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তোমাকে সাহায্য করবার জন্য।

ফেরেশতা?

ওইরকমই কিছু হবে। যারা মুহূর্তে হারিয়ে যায় বা অদৃশ্য হয়।

ও মায়ের কথা শোনে। ভাবতে থাকে আকাশ থেকে আলস্নাহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটা তো মানুষ। মৌটুসি সেই হাতের দিকে তাকায় যা ধরে লোকটা তাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এনেছিলেন। সেখানে হাত ধরবার কোন চিহ্ন নেই।

মৌটুসি অনেকদিন এই ঘটনাটি নিয়ে ভেবেছে যার উত্তর আজো পায়নি। কেবল বিশ্বাস করেছে হয়তো আলস্নাহ বিপদে এমন করে কাউকে পাঠিয়ে দেন, দেখতে মানুষের মত কিন্তু আসলে ফেরেশতা।

মৌটুসি পরে বুঝতে পারবে আসলে আলাহ আকাশে থাকেন না থাকেন আমাদের বুকের ভেতর। কখনো কোন বিশেষ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। পাগল চাচাতো তাই বলেন।

ছয়.

পরী ও পরাণের নতুন মা হয়েছে। এতে ওদের স্বাধীনতার কোন পরিবর্তন হয়নি। নতুন মা আর বাবা ব্যস্ত নানা সব কাজে। কাজেই ওরা কোথায় গেল আর কী করল সে নিয়ে তেমন ব্যস্ত নয় কেউ। তবে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার নিয়মটা আগের মতই আছে। নতুন মা টুসি বা শুভাশিসের মায়ের মত নয়। তিনি ফেরিওয়ালা ডেকে যখন খাবার কেনেন কেবল নিজের জন্য কেনেন। বয়স খুব বেশি নয়। বাবার কোন এক বন্ধুর মেয়ে। ঝিরসা, চানাচুর, নকুলদানা কিনে একা খান। এমন ঘটনা নতুন মায়েরাই করতে পারে, আসল মায়েরা নয়।

পরী ও পরাণ বুঝতে পারে। বাবা বলেন– তোদের নতুন মা একেবারে ছেলেমানুষ। আর একটু বয়স হলে সব ঠিকঠাক করতে পারবে। নতুন মা ওদের বাবার গরিব বন্ধুর ভয়ংকর সুন্দরী এক মেয়ে। যে কেবল ঠিকমত খেতে পারবে ভেবে বাবাকে বিয়ে করেছে। যখন নতুন মা কিছু কিনতে যান পরাণ ডাকে– পরী ঘরে আয়।

ভাইয়া আমি সরভাজা খাব।

খানিক আগে নকুলদানা খেয়েছিস না। এখন আবার সরভাজা?

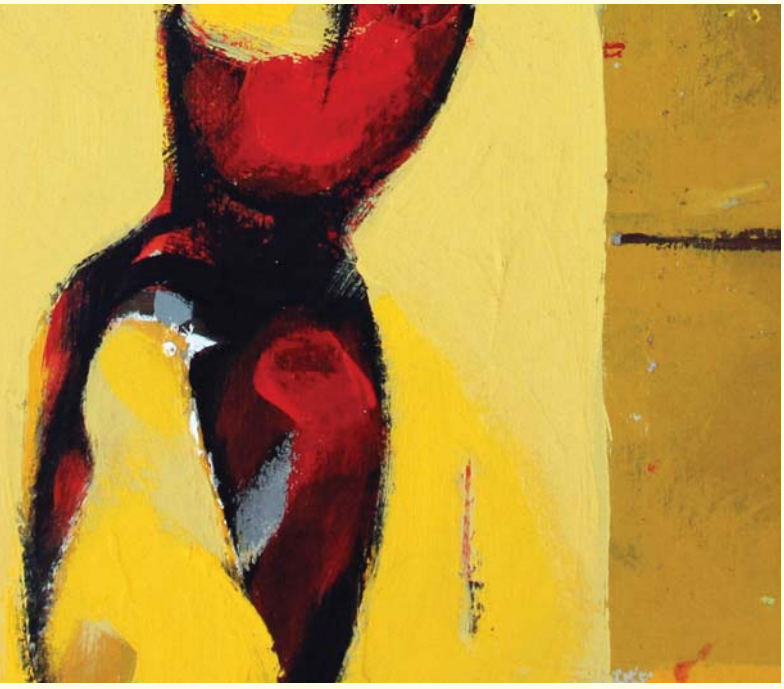

মাও তো খেয়েছেন, তাহলে?

চল টুসিকে দেখে আসি। কয়দিন পর ওরা চলে যাবে। ইস।

চল। পরী বলে।

হাতের বাটিতে সরভাজা নিয়ে নতুন মা ঘরে যাচ্ছেন। ওরা একবার সেদিকে তাকিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। নতুন মায়ের জরিপাড় শাড়ির ফ্রেমে যে মুখ সেখানে কাজলডোবানো ভালবাসার ছায়া নেই। নতুন মাকে একটুও সুন্দর মনে হয় না ওদের।

মৌটুসিদের বাড়িতে মহা সমারোহে বাঁধাছাদা চলছে। অনেক জিনিস ইতোমধ্যে চৈতালীতে চলে গেছে। আর সব কিছু যাবে বলে প্যাকেট, বস্ত্বায় রেডি হচ্ছে। – তোদের কথা ভাবছিলাম। তোরা না এলে আমি যেতাম। মৌটুসি বলে।

বেশ যে খুশি খুশি দেখাচ্ছে তোকে রে টুসি। পরাণ বলে।

নিজের ঘর, আর দোতালা, আর বাতাবিলেবুর গাছ, আর ওখানকার নতুন স্কুল আর...

থাক থাক তোকে আর আর আর করতে হবে না।

মৌটুসি বলে– পরী কালোকে দেখিস রে।

অবশ্যই দেখব।

ও মাছের কাঁটা পেলে দুধভাত খেতে চায় না। ওর চাঙারি, বিছানা, বালিশ সব নিয়ে যাসরে পরী।

নেব রে নেব। খুব লক্ষ্মী ছেলে কালো।

ঠিক খাবে আর ঘুমাবে। বাইরে যাবে যখন বাথরম্নম পাবে।

ওরা তিনজন হাসে। পরাণ বলে– মিস্টার কালোর বাথরম্নম পায়?

বা! পাবে না কেন? মার পুরনো শাড়িতে গদি করে দিয়েছি। ওখানে ঘুমাতে ও খুব পছন্দ করে।

আমাদের নতুন মায়ের এখনো পুরনো শাড়ি হয়নি। সব নতুন শাড়ি।

– কেমন নতুন মা?

ভাল। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

ও তাহলে তোমাদের স্বাধীনতার বারোটা বাজেনি। তারপর বলে– আমাকে তোরা দেখতে যাবি না?

সময় পেলে। ওরা সমস্বরে বলে।

পরীকে শুভাশিসের কথা বলেনি ও। কারণ পরাণ চায় না এমন কথা সকলে জানুক। খালি বলে– পরাণ তোর তো সাইকেল আছে। আমাকে তো যখন ইচ্ছা দেখতে আসতে পারবি।

শহরের মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে তোকে দেখতে আসা? দেখি যদি সময় হয়।

আমি শিস শিখলেই তোদের শোনাতে আসব। মৌটুসি বলে।

তারপর ওরা তিনজন বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আরো নানা গল্প করে।

যাওয়ার দিনে সাতসকালে আবার আসে পরী ও পরাণ। খালি ঘরে ঘুরে ঘুরে নানা কথা বলে। খালি ঘরে ওদের কথা গম গম করে। মা-বাবার বড় ঘরটা খালি। দুটো খাট, বইয়ের আলমারি, বেঞ্চে সাজিয়ে রাখা মায়ের বাক্স-তোরং কিছু নেই। বাবার লেখার টেবিল। সব চলে গেছে। কথা বললেই ইকোতে ভেসে আসা স্বর। ওরা একসময় বাইরে আসে। মিঠুপার জিনিসগুলো ঠেলাগাড়িতে। ওই ঘরটায় কেবল বাঁশবনের বাতাস। আর কিছু নেই।

ওরা বারান্দায় আজো আবার পা ঝুলিয়ে বসে। চেয়ে দেখে এইসব চলে যাওয়া। ও বাড়িতে মিঠুপা হীরাকে নিয়ে চলে গেছেন গোছগাছ করতে। একেবারেই যেখানকার জিনিস সেখানে সাজাতে। মনে হয় অনেকটা গুছিয়ে ফেলেছেনও ইতোমধ্যে। মৌটুসি বলেছিল আমার ঘর আমি গোছাব। ওর ছোট খাটটা জানালার পাশে থাকবে বলেছিল ও। একটি টেবিল আর একটি চেয়ার। দেয়ালে আয়না। নিচে ছোট তাকে কাজল, চিরুণি, শিশিমালতি।

ওরা তিনজন কালোর জিনিসপত্র ওদের বাড়িতে রেখে আসে।

মাস্টারপাড়ার এক টুকরো মাঠ, খেত, তিলি-তিসির গন্ধ ভরা সেইসব সময়, দিগন্ত, পুকুর, মস্ত আকাশ, হাঁটবার বন, কাঠঠোকরা, বড়ইয়ের উৎসব এইসব ফেলে ও চলেছে একটা দোতালা বাড়িতে, শহরের ঠিক মাঝখানে। ও দোতলা ঘরে বই পড়বে। আর মিঠুপার ঘরে গিয়ে কলের গান শুনবে। বাবা সস্তায় একটি কলের গান কিনেছেন। যেখানে চোঙের ভেতর দিয়ে গান আসে। রেকর্ডে কুকুরের ছবি। মৌটুসি ভাবে এই কলের গানের ভেতর ওর কড়ে আঙুলের সমান ছোট ছোট মানুষ লুকিয়ে থাকে। যারা সময় পেলে গান করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

বারান্দার খাম্বায় ঠেস দিয়ে নতুন মা বই পড়ছেন। পেছন থেকে কাজের মেয়েটা লম্বা চুলে তেল মাখাতে ব্যস্ত। তিনি ওদের দেখেন। কথা বলেন না।

আমরা আজ নতুন বাড়িতে চলে যাচ্ছি। মৌটুসি বলে।

ও। এই বলে আবার বইতে চোখ রাখেন নতুন মা।

পরাণ মৌটুসির হাত ধরে টেনে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন– উনি এখন নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের বই পড়ছেন। কথা বলবেন না। বাবাকে ইমপ্রেস করতে এইসব...। থেমে যায় পরাণ।

কালোর জিনিসপত্র রেখে বাড়িতে ফিরে আসবার সময় নতুন মাকে দেখতে পায় না মৌটুসি। বলে– তোরা আমাকে দেখতে আসিস।

আচ্ছা আচ্ছা, বলে পরাণ। পরীর করুণ মুখটায় কান্না চাপার প্রয়াস।

মাস্টারপাড়ার এক টুকরো মাঠ, খেত, তিলি-তিসির গন্ধ ভরা সেইসব সময়, দিগন্ত, পুকুর, মস্ত আকাশ, হাঁটবার বন, কাঠঠোকরা, বড়ইয়ের উৎসব এইসব ফেলে ও চলেছে একটা দোতালা বাড়িতে, শহরের ঠিক মাঝখানে। ও দোতলা ঘরে বই পড়বে। আর মিঠুপার ঘরে গিয়ে কলের গান শুনবে। বাবা সস্তায় একটি কলের গান কিনেছেন। যেখানে চোঙের ভেতর দিয়ে গান আসে। রেকর্ডে কুকুরের ছবি। মৌটুসি ভাবে এই কলের গানের ভেতর ওর কড়ে আঙুলের সমান ছোট ছোট মানুষ লুকিয়ে থাকে। যারা সময় পেলে গান করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। আর কী করবে মৌটুসি নতুন বাড়িতে গেলে? পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা? যে মেয়েটি সাঁতার জানে না। আর যে মেয়েটি কখনো দিগন্ত দেখেনি। আর জানে না শুভাশিসের মত কোন একজনকে।

সাইকেলে ওদের পিছু পিছু অনেকটা পথ এসেছিল পরাণ। তারপর মৌটুসি লব্য করে পরাণ নেই। কখন ও অন্যদিকে চলে গেল? যাবার সময় কোন কথা বলেনি। বড় বাজার, মারোয়াড়ি পট্টি, চালের আড়ত, মিষ্টির দোকান, মিরা টকিজ সব ছাড়িয়ে ওদের রিকশা গিয়ে পড়ল পুলিশ লাইনে। আর খানিক গেলেই চৈতালী।

সাত.

বাতাবি লেবু গাছে যেসব পাখি এসে বসে মৌটুসি তাদের চিনে ফেলেছিল। তিনটে তিন রঙের পাখি। একটির লেজ ছিল লম্বা। আর সবুজ। আর দুটো নীল আর লাল মেশানো। পাখিদের জানা হল জানালার পাশে বসে। বাতাবিলেবু গাছে বড় বড় বাতাবি ঝুলছে। যেগুলো মায়ের সরবৎ হয়ে টেবিলে শোভা পায়। মা সকলকে বলেন সেই সরবৎ খেতে। আবার বিলিয়েও দেন নতুন কাজের ছেলেটার হাতে। হীরা আসেনি। এখন নতুন কাজের ছেলে নুরু। মিঠুপা কাঁচামরিচ আর শর্ষের তেল দিয়ে বাতাবি মাখা করেন। টুম্পা নামের পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে লুডো খেলা হয়। ভাব হয়েছে একটু আধটু কিন্তু পরীর মত আন্তরিকতা নয়। সাপ লুডো আর এমনি লুডো। ওর বাবা-মা টুম্পার পড়াশুনার ব্যাপারে ভয়ানক কড়া। কাজেই টুম্পা আসে অল্প সময়ের জন্য। মৌটুসিও যায় অল্প সময়ের জন্য। ছুটির দিনে একটু বেশি সময়। টুম্পার ক্যারোম আছে। সে খেলা ভালই লাগে মৌটুসির। মৌটুসির ক্যারোম নেই। টুম্পার আর কোন ভাইবোন নেই। মা-বাবার শাসনে পরিত্রাহি অবস্থা ওর। তবে সে নিয়ে মুখে কিছু বলে না। ওর মা নতুন মা নয় কাজেই পুলিশ পুলিশ ভাব সারাক্ষণ। ওর নতুন মা আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। টুম্পার মা চমৎকার স্বাস্থ্যে ঝলমল। সর্দি বা জ্বরও হয় না। হাচ্চো রোগ পর্যন্ত ধরে না।

এই টুম্পি আর খেলা নয়। এবার পড়। তখন মৌটুসি চলে আসে বাড়িতে।

সেইসময় মৌটুসি একটি ব্যাপার খুব ভাল করে জেনেছিল। সে হল মনের ব্যাপার। এই যে মনে মনে টুম্পার মাকে যমের বাড়ি পাঠায়, আর নিজের মাকে নানার বাড়ি। ও জানে বাস্তবে এমন হলে ভাল লাগবে না। তাহলে মানুষ এমন ভাবে কেন? আসলে মানুষের ভাবনার ওপর সবসময় তার নিজের কোন হাত থাকে না। এমনি ভাবতে ভাবতে, বাতাবি লেবু গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চার নম্বর খাতায় কী সব লেখে ও নিজের মনে। মিঠুপা নাক গলিয়ে দেখে ফেলবার আগে খাতা লুকিয়ে রাখে। মনে হয় একটা গল্পের মত কিছু। গল্প হলে তার নাম দিতে হয়। সারাদিন সারারাত ভেবে আকাশ থেকে আঁকশি দিয়ে একটি নাম পেড়ে আনে– টুম্পার নতুন মা।

নিজের সেই 'নতুন মায়ের চিন্তা' এবার গল্প। গল্প হলে দোষ হয় না।

ইস্ আমার মাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেললি? টুম্পা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে।

বাঃ এতো একটা গল্প।

নতুন মা চাই না আমার।

আহা এটা তোর জীবনের গল্প নয়। তোর মত আর কেউ...

তাহলে মেয়েটার নাম রাখলি কেন টুম্পা?

ঠিক আছে আমি নাম বদলে করছি মিতির মা।

টুম্পা বাতাবিলেবু মাখা খেয়ে চলে যায়। যেতে যেতে বলে– আমি জানি যারা লেখে তারা এমনিই হয়। ফট করে কাউকে মেরে ফেলে, কাউকে অসুখ দেয়। কাউকে গাড়ি চাপা দেয়। আমি লিখলে তোর মত এমন পচা লেখা লিখব না। সকলকে বাঁচিয়ে রাখব।

কিন্তু লেখাতেই তো টুম্পার সরি মিতির কত স্বাধীনতা দিয়েছি। যখন মনে হয় পড়বে, যখন মনে হয় খেলবে। মজা না?

কচুর স্বাধীনতা! মুখ ভার টুম্পা চলে যায়। সে মৌটুসির মত স্বাধীনতা নিয়ে কী করবে। সাঁতারও জানে না, দিগন্তও চেনে না। সে বাবা-মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে একদিন গলায় টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে মস্ত ডাক্তার হবে না হলে তেমনি কিছু।

ইস্ কেন যে ওর নামটা ব্যবহার করলাম। ওকি আর আমাদের বাড়িতে আসবে না? মনে মনে ভাবে মৌটুসি।

পাশের ঘরে কলের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিঠুপা গাইছে– এলো বরষা যে সহসা মনে তাই/ রিমঝিম ঝিম রিমঝিম ঝিম গান গেয়ে যাই। গান শুনতে শুনতে, ভেজা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, লেজ ঝোলাদের মাতামাতি দেখতে দেখতে চার নম্বর এক্সারসাইজ খাতায়

কচুপাতার ফোঁটা ফোঁটা পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টল টল শিশিরের মত টল টল কবিতা বানায় ও– পরী পরাণ আমি তোদের দেখতে যাব/ পরী পরাণ আমি তোদের ভালবাসব। ভালবাসা শব্দটা ছিট ছিট কচুপাতার উপরের নীরব ফোঁটার মত টল টল করে। বার বার আবৃত্তি করতে করতে ছন্দ নামের একটি কঠিন ব্যাপারের হয়তো খানিকটা বুঝে ফেলে। পাঁচ আর পাঁচ। দেখতে যাব/ ভালবাসব। শুভংকরের ফাঁকির মত সেই পাঁচ পাঁচ গোনা। মৌটুসি আরো নানা কিছু বানায়। কচু পাতা/ মাথায় ছাতা। এমনি নানা গোনা গুনতি। অংক ওর ভাল লাগে না। কবিতার কারণে অংক বেশ লাগে এখন।

একদিন কালো কালিতে লেখে পাখিটা বৃষ্টিতে ভিজে সারা/ বৃষ্টি বৃষ্টি একি অনাসৃষ্টি। তারপর? কী ভাবতে চকির তলা থেকে বের করে সেই গল্পের খাতা। লেখে একটি গল্প– মুনির আবির ও পরিমলের বিকেল। ও জানে আসল নাম দিতে নেই। তাই পরাণ, শুভাশিস, মৌটুসি নামগুলো বদলে দেয়। ও বুঝতে পারে ওর ভেতরে আর একটা মৌটুসি বাস করে– রাশিয়ার পুতুলের মত। একটির পেটের ভেতর আর একটি, তার পেটে আর একটি। পাগলচাচা ওকে রাশিয়ার পুতুল দিয়েছেন। কিন্তু বাবা-মা তাঁর সঙ্গে আর ওকে বেড়াতে যেতে দেন না। পাগলচাচা মাঝে মাঝে এসে আবোল তাবোল গল্প করেন।

ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখে মে মাসের দুই তারিখে ওরা এসেছিল আর এখন জুলাইয়ের পনেরো তারিখ। এতদিন ওদের কারো সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। ওরা আসেনি, ওরও যাওয়া হয়নি। এক গানের অনুষ্ঠানে একটুখানি দেখেছিল ওদের। বলেছিল আসব। কিন্তু আসেনি।

কচুপাতার ফোঁটা ফোঁটা পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টল টল শিশিরের মত টল টল কবিতা বানায় ও– পরী পরাণ আমি তোদের দেখতে যাব/ পরী পরাণ আমি তোদের ভালবাসব। ভালবাসা শব্দটা ছিট ছিট কচুপাতার উপরের নীরব ফোঁটার মত টল টল করে। বার বার আবৃত্তি করতে করতে ছন্দ নামের একটি কঠিন ব্যাপারের হয়তো খানিকটা বুঝে ফেলে। পাঁচ আর পাঁচ। দেখতে যাব/ ভালবাসব। শুভংকরের ফাঁকির মত সেই পাঁচ পাঁচ গোনা। মৌটুসি আরো নানা কিছু বানায়। কচু পাতা/ মাথায় ছাতা। এমনি নানা গোনা গুনতি। অংক ওর ভাল লাগে না। কবিতার কারণে অংক বেশ লাগে এখন। এই প্রথম বোধকরি ও অংককে ভালবাসতে শুরু করে।

মিঠুপা এখন ক্লাশ নাইনে। ও ফোরে। ও আরো কয়েকটি পছন্দের রেকর্ড পেয়েছে। রবিভাইয়া ওকে *রানার* নামের একটা রেকর্ড দিয়েছে। পাগলচাচাও দিয়ে যাচ্ছে নানা সব রেকর্ড। মৌটুসি রবিভাইয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে *রানার* শিখতে চেষ্টা করেছে। ওর এখন অনেক বই। বড় একটা কাগজের বাক্সে সব ওর বিছানার তলায় রাখা। *আম আঁটির ভেঁপু* আর *আংকল টমস কেবিন*– রবিভাইয়ার উপহার। আহারে *আংকল টমস কেবিন* পড়ে সাতদিন বুক ব্যথায় কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করেনি ওর। আর পেয়েছিল মুঠো মুঠো লাল নীল কাগজে মোড়া চকলেট। কতগুলো লুকিয়ে রেখেছে। যখন পরী ও পরাণকে দেখতে যাবে চকলেট সঙ্গে নেবে। আর নেবে পাঁচপাতার সেই গল্পটা। মিঠুপা কেবল ক্লাশ নাইনে– এখনই ম্যাট্রিকের কথা ভাবছে ও।

একদিন পাগলচাচার সঙ্গে বাইরে যাবার অনুমতি পেলে ও বলল– চাচা আমি মাস্টারপাড়ায় যাব। মা-বাবা বললেন– সাবধানে যাবি। রিকশায় যাবি আর রিকশায় ফিরে আসবি। উনি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তারপর তোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। সাবধান।

আসলে মাঝখানের গিজগিজ বাজার না থাকলে মৌটুসি নিজেই যেতে পারত।

প্যান্টের পকেটভর্তি চকলেট। হাতের ছোট্ট পাস্টিকের ব্যাগে *আংকল টমস কেবিন* আর ওর লেখা সেই গল্প। ও বইটা ওদের দেবে ভেবেছে। একই শহরে তবে বেশ কিছুদিন পরে যাচ্ছে ও।

ওদের ফেলে আসা বাড়িটাতে নতুন মানুষ এসেছে। জানালায় নতুন পর্দা। বাতাসে উড়ছে। এ পাড়ার দু'একজন ওকে দেখতে পেয়ে হাসে। কেউ কেউ মা-বাবা কেমন আছেন এমন নানা প্রশ্ন করেন। পাগলচাচা বলেন– তিনি ঠিক দেড়ঘণ্টা পরে এসে ওকে নিয়ে যাবেন।– সাবধানে থেকো। হারিয়ো না।

এখানে হারানো সহজ নয়। এর সব আমার চেনা।

বেশ বেশ।

বাড়িতে ওদের পায় না। নতুন মা লেবু শুঁকছেন আর বই পড়ছেন আর দাসী তার চুলে তেল মাখাতে ব্যস্ত। ওকে কী বলতে বলতে হড়বড় করে বমি করেন। মনে মনে বলে মৌটুসি– আর একা একা সরভাজা, গজা খাবে? মানুষের চোখ লাগে। ইচ্ছা না করলেও লেগে যায়। লাগুক!

মৌটুসি বুঝতে পারে পরী ও পরাণ এখন পুকুরে। সোজা চলে আসে পুকুরপাড়ে। সাড়ে তিনটায় পুকুরে নামা রোজদিনের কাজ ছিল ওর– কেবল শুক্রবারে নয়।

ঠিক পেয়ে গেল। পরী ও পরাণ পুকুরে ভাসছে। আর ওদের মাঝখানে একটি অপরিচিত মুখ স্থলপদ্মের মত ভেসে আছে। মেয়েটির চুলগুলো পানির সাপের মত চারপাশে ছড়ানো। চিৎসাঁতার দিয়ে তিনজন ওপারে যাবে ঠিক করেছে। আগে-পিছে নয়, একসঙ্গে। এ খেলা ওর চেনা।

'প-রী–প-রা-ণ–' ঘাটে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে ডাকে ও। তারপর বলে– তাড়াতাড়ি উপরে আয়। তোদের জন্য পকেটভর্তি...। বলেই হাসে। তারপর বলে– এ ছাড়া আরো একটি জিনিস আছে।

ওকে দেখে ওদের সাঁতারের গতি পরিবর্তন হয় না, তেমন উৎসাহ নেই কারো গলায়। ওদের ফেলে যে অন্য জায়গায় চলে গেছে তাকে দেখতে এই মজার খেলা বাদ দিয়ে উপরে উঠতে হবে তার কোন মানে নেই।

এই টুসি আর একদিন আসিস। না হলে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা কর। পরাণের গলার স্বর বদলে গেছে এমন মনে হয়।

এতক্ষণ থাকতে পারব না। উঠে আয় না পিজ।

অনেকদূর থেকে পরাণ বলে– আর একদিন আয় নারে টুসি পিজ।

পরী হাত তুলে কী যেন বলতে চায়। ও শুনতে পায় না। স্থলপদ্ম মিষ্টি করে বলে– টুসি এখন সময় নেই। আর একদিন এস। এইভাবে যাব আর এইভাবে ফিরে আসব। প্রতিযোগিতার ব্যাপার।

মৌটুসি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা দূর থেকে দূরে চলে যায়।

আবার সে কবে আসবে? কাল বাবা বলছিলেন– শুধু শুধু বাড়ি বদলালাম মনে হচ্ছে রবির মা। বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি ওরা আমাকে যশোর বদলি করবে। ওখানে কী সব গোলমাল।

যেখানেই গোলমাল সেখানেই তোমাকে পাঠায়। ভাল মানুষ হওয়ার এই জ্বালা। মা বলছিলেন বাবাকে। শিক্ষাবিভাগে বাবার সুনাম আছে সৎ মানুষ নামে।

মনে হয় এই বাড়িটাকে বেশ ভালবেসে ফেলেছেন মা।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

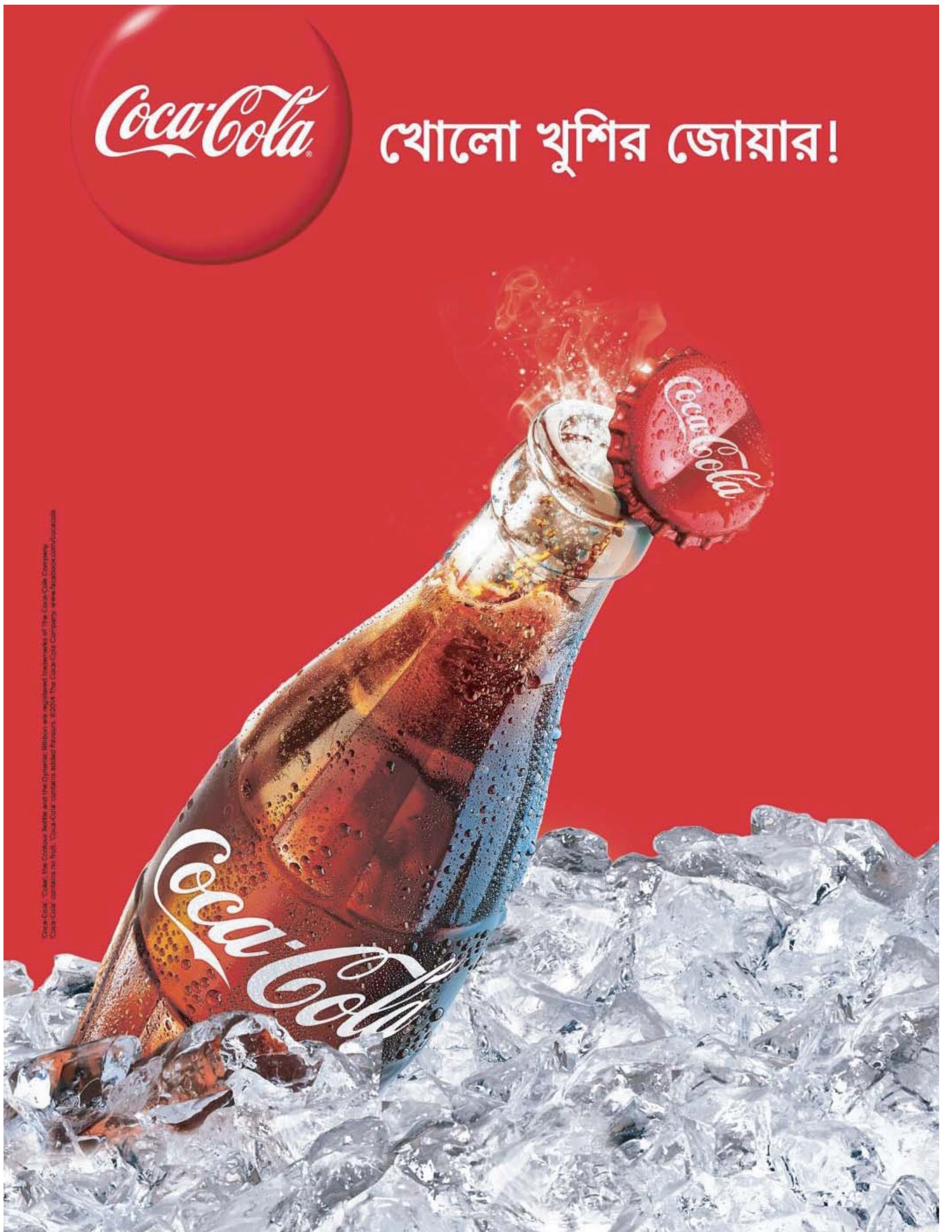
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

অনুবাদ গল্প

ভাঙা খেলনা

কিশোরীচরণ দাস

বাগানের খানিকটায় রোদ। যেখানে এক সার গাঁদা। ফুল ফুটে রয়েছে সেইখানে রোদ শেষ হয়েছে। ফুল কতক রোদে, কতক ছায়ায়। কতক রোদ পোহাচ্ছে, আর কতক বেচারা ফুল শীতে কাঁপছে বুঝি-বা। এ দিকের ফুলে প্রজাপতি বসেছে– ওদিকে যাবে না? ঐ যে গেছে– গেছে। দূর্, আবার ফিরে এল। দুষ্টু! এদিকের ফুলেরা হাসছে। এক এক করে সবাই পাপড়ি মেলে হাসছে। ওদিকের ফুল হাসছে না। ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে চেয়ে আছে নিচুপানে। হাত দিলে হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ফুল গরম হবে না।

(পায়ের তলায় চীনাবাদামের খোলাটা চেপটে গেল। গীতা সেটা পায়ে ঠেলে দিয়ে ফেলে দিল নিচে, আধমরা সেঁউতি গাছের গোড়ায়। দশ বছরের মেয়ে। বড়দিনের ছুটির দুপুর, বাড়ির পিছনের দিকে সিঁড়ির ধাপে বসে চেয়ে আছে রোদের দিকে। চিন্তার ছবি বয়ে চলেছে মনের মধ্যে।)

আমাদের স্কুলে বড় ফুল আছে। গোল গোল ফুল, হলদে পাপড়ি। সান্ ফ্লাওয়ার। কুলিআ বলে সূর্যমুখী। তারা নাকি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। কুলিআটা মিথ্যুক।

ওই যে রে একটা প্রজাপতি! কি সুন্দর নকশাওলা প্রজাপতি, হলদে গায়ের ওপর কালো কালো দাগ দাগ। নকশাওলা পাকা কলা। নকশাওলা ক্যানা ফুল। যাই ধরি গিয়ে। ওই যা, উড়ে গেল। গেল ওদের বাড়িতে। পাখা দুটো খালি নাড়ছে। একবার ওপরে একবার নিচে। পপিও তার ল্যাজ নাড়ছে অমনি। এক– দুই– দিন– চার। ওদের বাড়ির দিকে গেল। কোথায় গেল?

সেদিন মাঝরাত। কী স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি আলো জ্বলছে, বাবা চেয়ে আছেন উপর পানে। অন্য কারু মত, আমাদের বাবার মত নয়। কাঁদছিলেন না, আমার মনে হল যেন কাঁদবেন। ভয় করতে লাগল। 'বাবা' বলে ডেকে উঠতেই চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন– শুয়ে পড়, কেন চেঁচাচ্ছ? সে বাবা আমাদের বাবা নয়। বাবার কী হয়েছে।

সান্ ফ্লাওয়ার সুন্দর নয়। খালি বড় বড় মুখ। মিসেস ঘোষালের মত। হো হো করে হাসেন। বড় বড় দাঁতগুলো দেখা যায়। তাঁর লম্বা কোটের বোতামগুলো এত বড় বড়। মোটা ফরসা হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ান– স্টপ টকিং।

মাস্টারমশায় আসেননি। মা ঘুমোচ্ছে, মার মুখ সুন্দর। কিন্তু মা খালি রাগ করে আজকাল। হাসলে মার মুখ সুন্দর দেখায়, রাগলে বিচ্ছিরি লাগে। মিছিমিছি রাগ করে আমার ওপর। কাল রাজু আমার ছবির বই ছিঁড়ে দিল, আমার রঙিন পেনসিল ভেঙে দিল, আর আমি মারলে দোষ হল আমার। মা আমায় মারল, রাজুকেও মারল। চিৎকার করে করে বলল– তোরা মরতিস্ তো... কি কুলাঙ্গার ছেলেমেয়ে... মা খালি খালি রাগ করছে, মিছিমিছি রাগ করছে।

মা কুলিআর ওপরেও রাগছে। রাগ করে সেদিন দুধের গস্নাসটা এমন ঠেলে দিল যে ভেঙে গেল। আর আমরা যদি ভাঙতাম!

রোদ গেছে ঐ ক্যানা ফুলের গাছ অবধি। খালি লম্বা লম্বা বড় বড় পাতা। ফুল বলে কিছু নেই। আমাদের স্কুলে কত ফুল ফুটেছে– লাল, হলদের ওপর লাল লাল ছিট ছিট। শোভা সেদিন বকুনি খেল ফুল ছিঁড়েছিল বলে। মা আমাদের বাগান মোটে দেখে না আজকাল, খালি মালীর ওপর রাগ করে।

শীত করছে। পপি কুকুরটা বোকা, ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। শীত করছে না ওর? ওদের বাড়ির ঐ বিচ্ছিরি কালো কুকুরটা এলে ছুটে পালাবে পাজিটা।

ওই যে রে একটা প্রজাপতি! কি সুন্দর নকশাওলা প্রজাপতি, হলদে গায়ের ওপর কালো কালো দাগ দাগ। নকশাওলা পাকা কলা। নকশাওলা ক্যানা ফুল। যাই ধরি গিয়ে। ওই যা, উড়ে গেল। গেল ওদের বাড়িতে। পাখা দুটো খালি নাড়ছে। একবার ওপরে একবার নিচে। পপিও তার ল্যাজ নাড়ছে অমনি। এক– দুই– দিন– চার। ওদের বাড়ির দিকে গেল। কোথায় গেল? ওই ওদের বাড়ির বাবা এলেন ওঁদের ছোট খোকাকে কোলে করে। এত শিগগির আফিস থেকে ফিরে এসেছেন! আর আমাদের বাবা আসবেন সেই এক পহর রাত করে।

ওঁদের খোকাকে আদর করছেন, পাখি দেখাচ্ছেন। ওর নাম কী যেন– টুনু? আমাদের অমনি একটা খোকা থাকত যদি রাজু-বিজুর মজা বেরিয়ে যেত। মা তাকে আদর করত, রাগত না।

আমাদের বাবা আমাদের আদর করেন, তা রাজু-বিজুকে বেশি আদর করেন। আমি বড় হয়ে গেছি কিনা। বাসন্তী বলে তার বাবা নাকি তাকে যেতে আসতে আদর করেন। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার, আর মাঝে যত ইচ্ছা তত– অহঙ্কেরে একটা।

কিন্তু বাবা আজকাল তো কাউকে আদর করেন না। ফিরবেন সেই রাত হলে। গুম হয়ে বসে থাকবেন খাটের ওপর। কোন কথা বলতে গেলে– আঃ, বিরক্ত কোরো না মানুষকে– যাও না, খেল গিয়ে। মা জিজ্ঞেস করবে– খাবার আনি? কিছু দরকার নেই– আস্তে করে বলবেন। হাসবেন না, কিছু না।

কী হয়েছে বাবার? আগে তো এমনি ছিলেন না। আমরা যখন পুরীতে থাকতাম– কত দিন হয়ে গেল– বাবা বেলা থাকতে আপিস থেকে ফিরতেন। মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে লুচি আলু ভাজা তৈরি করত। নাকে-চোখে ধোঁয়া ঢুকত। বাবা একেবারে এসে আমায় কোলে টেনে নিয়ে আদর করতেন। বাবা খালি হাসতেন।

বাবা কি বুড়ো হয়ে গেছেন? কই দাঁত পড়েনি তো, চুলও পাকেনি। রমা অপা (দিদি)-র জেজে (ঠাকুরদাদা) কত বুড়ো, চুল সব সাদা হয়ে গেছে। কত হাসেন তিনি। আমাদের সব কাছে ডেকে লজঞ্চুস দেন– গান শেখান–।

বাবা কত গান শেখাতেন আগে। ভজন, সিনেমার গান, হিন্দি, ওড়িয়া–। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম', 'দেহী হমে আজাদি বিনা'–।

(গীতা গুনগুন করে গান শুরু করল। পায়ের পাতাটা ওপর নিচে নাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ থামল। তার ছোট মুখখানি গম্ভীর হয়ে নরম কাঁদো কাঁদো হয়ে এল। আর একটু হলেই কেঁদে ফেলবে যেন।)

বাবা কাঁদছিলেন। বাবা আর গান গাইবেন না। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন।

সেদিন মাঝরাত। কী স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি আলো জ্বলছে, বাবা চেয়ে আছেন উপর পানে। অন্য কারু মত, আমাদের বাবার মত নয়। কাঁদছিলেন না, আমার মনে হল যেন কাঁদবেন। ভয় করতে লাগল। 'বাবা' বলে ডেকে উঠতেই চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন– শুয়ে পড়, কেন চেঁচাচ্ছ? সে বাবা আমাদের বাবা নয়। বাবার কী হয়েছে।

টিং টিং টিং। মাস্টারমশাই এলেন? না– রম্নটিআলা। মা উঠবে।

ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ–। বিজু ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদছে। মা উঠবে। রাগবে আমার উপর।

– গীতা– এই গীতা– গেল কোথায় সে– পড়া নেই শোনা নেই কোথায় গিয়ে বসে আছে পাড়াবেড়ানী কে জানে।

– যাই মা।

দুই.

'চকা চকা ভউঁরি
মামু ঘর চউঁরি
মামু মোতে মাইলে (মামা আমায় মারলেন,
কেতে কথা কইলে (কত কথা বললেন)–

– এই বিজু, হাত ছাড় না। তাড়াতাড়ি হাঁট। –পুনি, তুই আমার হাত ধর্।–

আচ্ছা, আয় ইস্কুল ইস্কুল খেলি। বল–

আজ নীরাদিদি বললেন– ‘গীতা ইজ এ গুড গার্ল, গীতা ইজ এ গুড গার্ল।’ অঙ্কে দশের মধ্যে দশ, ইংরেজিতে দশের মধ্যে আট আর ড্রইংয়ে ফার্স্ট। নীরাদিদি বললেন– এমনি ভাল করলে তুমি তো ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যাবে। সুমিত্রা আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। রাগছিল বোধহয় আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব বলে। মা আজ কত খুশি হবে। আদর করবে, আজ মার জন্মদিন।

‘রিং আ রিং ও রোজেস
পকেট ফুল অব্ পোজিস–’

(গীতাকে নিয়ে রাজু-বিজু আর পাড়ার মেয়ে পুনি নতুন গান আরম্ভ করে দিল। আর সবাইয়ের সঙ্গে ছোট্ট বিজু গাইতে থাকে ‘লিঙ্গা লিঙ্গা লোজেস্–।’ সকালের ঠাণ্ডা যায়নি। অদিনের অদরকারি মেঘ কেটে দিয়ে রোদ উঠেছে এতক্ষণে।)

–অল্ ফল্ ডাউন্।

ধপ করে বসে পড়ল সবই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। গীতা তাকাল সামনের দিকে। ডান দিকে পধানদের খিড়কির গায়ে জলের নালা। সামনে ঘাসে ভরা মাঠ।

এখানে ওখানে পাথর আর ঝোপ ঝোপ গাছ। তার ওপাশে উইঢিপি আর কত দূরে বাবার আপিসের লাল বাড়ি। রোদ উঠে কার গায়ের কোথায় এসে ছুঁচ্ছে।

নালার কাছে ওগুলো পাথর নয়, এক একটা হীরে। ওগুলো নিয়ে এসে গোল গোল করে কেটে নিলে কত বড় মালা হয়ে যাবে। মাস্টারমশাই বলেন হীরে সব চাইতে দামী জিনিস। সব চাইতে উজ্জ্বল, অন্ধকারে আলো বেরোয়। মা খুশি হবে। বলবে– দেখেছ, গীতা আমায় প্রেজেন্ট দিয়েছে।

কে আসছে পধানদের বাড়ি থেকে। বাবুআ আর তার বাবা। বাবুআ সবুজ সোয়েটার পরেছে। হাতে একটা লাঠি। মোটা ছেলে, আদুরে ছেলে। সব খেলা ভেঙে দেবে এখুনি। বলবে– খেলব ‘চোখ নেই কান নেই, লেগে গেলে দোষ নেই।’ সবাইকে মারবে, কেউ কাঁদলে বাবার কাছে আদুরেপনা করবে। মেনীমুখো ছেলে সব সময় বাবার কোঁচা ধরে বেড়াবে। ক্লাসে তো ফেল হয়, এদিকে সর্দারির অন্ত নেই।

ওর কাছে ওর বাবা। ফরসা রোগা কী সুন্দর দেখতে। সব সময় মুচকে মুচকে হাসেন। ‘নূআবোউ, খিদে পেয়েছে খাবার কি আছে’ বলে ভিতরে চলে আসেন। মা হাসে, আলমারি থেকে কিছু বের করে আনে, নয়তো রান্নাঘরে গিয়ে কিছু তৈরি করতে বসে খেতে দেবে বলে।

বনুকাকা ফরসা সুন্দর, বাবুআটা মোটা বিচ্ছিরি। ওর মা-ও তেমনি, কিন্তু মোটা নয়। ‘কাকী’ বললে মানা করেন, বলেন– বল মাসী। কোথাও যান না। খালি আয়নার কাছে বসে মাথার চুল আঁচড়ান। আর নাকি তিন বেলা স্নান করেন।

– কি রে গীতা, মা আছে?

লাঠি ঠুকে বাবুআ চেঁচাচ্ছে– অ্যাটেনশন্।

– হ্যাঁ যাচ্ছি। – বাবুআর কি স্কুল নেই বনুকাকা?

– নো নো নো, বাবা স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন। বাবা, দেখ না, গীতা আমায় রাগাচ্ছে।

মুচকি হেসে দু’জনকে একটু একটু চাপড়ে দিয়ে বনুকাকা ভিতরে চলে গেলেন। এদিকে বাবুআর নেতৃত্বে খেলা হচ্ছে। খেলা নয়, দৌড়াদৌড়ি, চোর চোর। গীতা একলা পড়ে গেল, নিজেকে একলা করে দিল বললে ভুল হবে না।

মা আর বনুকাকা খিড়কির দিকে গেছেন। বনুকাকার হাসি শোনা যাচ্ছে। কত হাসেন উনি। খিড়কির বাগানে ফুল ফুটেছে, টোমাটো হয়েছে, চিকন কালো কালো বেগুন হয়েছে, বাবা ভালবাসেন, কিন্তু সেদিন তরকারি খারাপ হয়েছিল, মা বেগুন ভাজবে বলাতে বললেন– থাক দরকার নেই। রেগে বলেননি, অমনি বললেন। মা চুপ করে গেল।

মা আমায় বুঝছে না। বনুকাকা হাসছেন। তাঁর হাসি দেখে রাগ হচ্ছে। ট্রেন চলে যাচ্ছে। মোটা মোটা চাকা। কালো কালো ধোঁয়া।

ওরি নীচে বনুকাকা শুয়ে পড়েছেন। আর হাসবেন তখন?

তিন.

(বিকাল হয়ে গেছে। গীতা স্কুল থেকে হেঁটে আসতে আসতে মাঝে মাঝে কয়েক পা দৌড়ে যাচ্ছে। ছোকরা চাকর কুলিআ পিছন পিছন আসছে বইখাতা বয়ে।)

আজ নীরাদিদি বললেন– ‘গীতা ইজ এ গুড গার্ল, গীতা ইজ এ গুড গার্ল।’ অঙ্কে দশের মধ্যে দশ, ইংরেজিতে দশের মধ্যে আট আর ড্রইংয়ে ফার্স্ট। নীরাদিদি বললেন– এমনি ভাল করলে তুমি তো ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যাবে। সুমিত্রা আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। রাগছিল বোধহয় আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব বলে।

মা আজ কত খুশি হবে। আদর করবে, আজ মার জন্মদিন। খুশি হয়ে নিশ্চয় পুরস্কার দেবে। রিবন, কেক, নয়তো এক গোছা পেনসিল।

আজ মার জন্য প্রেজেন্ট কিনেছি, এক টাকার প্রেজেন্ট। কতদিন ধরে জমিয়ে জমিয়ে এক টাকা করেছি। এমন প্রেজেন্ট আর কেউ বোধ হয় আনতে পারবে না। রাজুটা কী দেবে? রবার একটা, নয়তো রাংতা একটুখানি দিয়ে বলবে– এই আমার প্রেজেন্ট। একদিন পরেই আবার চেয়ে নেবে, না দিলে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকবে। রাজুর বুদ্ধি হয়নি।

আমার চেয়ে ভাল প্রেজেন্ট কি অন্য কেউ আনবে? বাবা কী আনবেন? নিশ্চয় কিছু ভাল জিনিস হবে। মা দু’জনের জিনিস তাকের উপর সাজিয়ে সবাইকে বলবে– এই দেখ বাপ আর মেয়ের প্রেজেন্ট।

আর বনুকাকা? তিনি কী আনবেন? তিনি কেন কিছু আনবেন? তিনি মার কে যে–

না, আনুন না। কী হয়েছে তাতে? মা খুশি হবে।

মা কি তাঁর দেওয়া জিনিস পেয়ে বেশি খুশি হবে?

...লম্বা লম্বা তাল গাছ। মাথায় একরাশ খাড়া খাড়া চুল। গাটা হাড়ের মত, সব যেন চাঁচা হয়ে গেছে। খালি মাথাটা বাকী আছে। এ কী– মাথার ভিতর থেকে লাল কি উঁকি মারছে! সিঁদুর লাগিয়েছে? উঁহু, মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। না না, মাথায় কে খানিকটা আবির মাখিয়ে দিয়েছে। হোলি খেলছিল ও। এসডিও-র বাংলো এল। আর একটু গেলেই আমাদের বাড়ি।

আজ মার জন্য প্রেজেন্ট কিনেছি, এক টাকার প্রেজেন্ট। কতদিন ধরে জমিয়ে জমিয়ে এক টাকা করেছি। এমন প্রেজেন্ট আর কেউ বোধ হয় আনতে পারবে না। রাজুটা কী দেবে? রবার একটা, নয়তো রাংতা একটুখানি দিয়ে বলবে– এই আমার প্রেজেন্ট। একদিন পরেই আবার চেয়ে নেবে, না দিলে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকবে। রাজুর বুদ্ধি হয়নি।

অন্ধকার হয়ে গেছে। সিনেমার ছবি দেখা যাচ্ছে না। মাঠের দেয়ালের কাছে জলের সরু ধারা একটা, কালো কালো দেখাচ্ছে। কাছে যাব? না– ওর ভিতর সেদিন ছিল একটা কালো পোকা। পোকাটা আছে বোধহয় এখন। অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে, ঘাসের ভিতর চুপচাপ করে। রাক্ষসী বুড়ি, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে একলা, কাছে গেলে টপ করে গিলে খাবে।

...নানীটা হিংসুটী। হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। অলক্ষুণী। কেন দেখা হল ওর সঙ্গে? কেন ওকে বললাম প্রেজেন্টের কথা? আমার দেখাতে বলল। আমি দেখলাম না তাই বলল– আমাদের বাড়িতে এ সব চলে না, বাবা রাগ করেন, বলেন ও সব চালিয়াতি ঢং। হু, গেঁয়ো অলক্ষুণী। নিজে তো যা ভাল মেয়ে । সূর্যমণি ওদের ক্লাসে পড়ে, বলছিল– ও ক্লাসে মার খায় আর মার খেলে হুয়া হুয়া করে কাঁদে শেয়ালের মত! বাড়িতেও মার খায় হয়তো, ওর মা কি ওকে মারে না?

আমার মা কি বেশি মারে? না– এখনই না এমনি মারছে, নয়তো আমার চেয়ে রাজু বেশি মার খায়।

আজ মার জন্মদিন। আজ মার মনটা নিশ্চয় খুশি আছে। আমার প্রেজেন্ট পেয়ে আরো খুশি হবে মা। জন্মদিনে মন ভাল থাকলে এক বছর অবধি মন ভাল থাকে না? তাহলে মা আর রাগবে না– আজ থেকে...

ওই আমাদের বাড়ি এসে গেল। এই যে মাইল-পোস্ট। তারপর উইঢিপি, রানী উইঘর বানিয়েছে; তারপর ফুটবল ফিল্ড-এর দেয়াল। নার্গিস নাকে নোলক পরেছে। মা বলছিল ঠাকুরমার অমনি নোলক ছিল। তারপর– তারপর আমাদের বাড়ি।

বাড়িতে আলো জ্বলেছে। বাইরে কেউ নেই। মা বোধহয় ভিতরে। বাবা আপিস থেকে ফেরেননি বোধহয়। রাজু-বিজু কী করছে, বেড়াতে গেছে? ওদের বেশ মজা। আসছে বছর স্কুলে গেলে রাজুর মজা ফুরিয়ে যাবে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। সিনেমার ছবি দেখা যাচ্ছে না। মাঠের দেয়ালের কাছে জলের সরু ধারা একটা, কালো কালো দেখাচ্ছে। কাছে যাব? না– ওর ভিতর সেদিন ছিল একটা কালো পোকা। পোকাটা আছে বোধহয় এখন। অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে, ঘাসের ভিতর চুপচাপ করে। রাক্ষসী বুড়ি, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে একলা, কাছে গেলে টপ করে গিলে খাবে।

শীত করছে। গায়ে হাতে কেমন একটু একটু ফুলে ফুলে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শীতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে? ভয় করলে তো গায়ে কাঁটা দেয়!

প্রেজেন্ট কই? প্রেজেন্ট হাতে আছে তো? (গীতা মুঠো করে ধরল তার হাতের কাগজের মোড়কটা। তার হাঁটা আস্তে হয়ে গেল বাড়ির ফটকের কাছে এসে।)

ঘরে আলো জ্বলছে, বাইরেটা অন্ধকার, কেউ নেই। ফুলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পূজারী দরজা খুলে দিয়েছে। মা কই? মা গেছেন মিশ্র বাবুদের বাড়ি। ছেলেরা খেলতে গেছে। বাবু আপিস থেকে ফেরেননি।

মা নেই, কেউ নেই। মার কি মনে নেই আজ ওর জন্মদিন?

না, মা এখুনি ফিরে আসবে। আমি মাকে বলব আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। মা আসার আগে আমি আমার প্রেজেন্ট গুছিয়ে রাখব মাঝের ঘরে, আলোর নীচে। মা খুশি হবে। কেউ নেই, ভালই হয়েছে।

আচ্ছা, আগে ওটা বাইরের ঘরে নিয়ে যাই, সেইখানে ওটা খুলে ঠিকঠাক করে তারপর মাঝের ঘরে নিয়ে যাব।

(বাইরের ঘরে যেতে যেতে গীতা দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের বাগানের দিকের দরজার কাছে। দরজা খোলা।)

চারদিক অন্ধকার। গাছের কাছে বেশি অন্ধকার। অন্ধকারে কথা শোনা যাচ্ছে। কথা নয়– বাতাস, বাতাসে গাছ কথা বলছে। কত দূরে কাদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। চৌধুরীদের বাড়ির দোতলায় আলো জ্বলছে। আলো বাতাসে কাঁপছে না কেন?

বাইরের ঘরের আলো জ্বলছে। দেয়ালে ফটো টাঙানো– মা আমায় কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। মা হাসছে না।

বাতাসে অন্ধকার কাঁপছে, কথা বলছে; কিন্তু আলোয় কিছু হচ্ছে না। মা আলোতে রয়েছে একলা, কাঠের মত চুপটি করে, সেখানে বাতাস যাচ্ছে না। বাতাস সেখানে এলে মাথার চুল ফুর ফুর করে উড়ত। মার ঠোঁট কেঁপে উঠত। মা হাসত, কথা বলত, রাগত–।

মা যদি সত্যি এই ফটোর মত হয়, রাগ করাও বন্ধ করে দেয়–।

ওই ওদিকে পুলিশ লাইনের মাঠের ওপর চাঁদ। খানিকটা কেটে বাদ দেওয়া। ছুরি দিয়ে কাটার মত নয়, কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। তার চারিদিকে গোল করে ছাই ছাই মত আলো– কুয়াশা।

চাঁদ মামা। ওকে মামা বলে কেন? মার ভাই, মার চার ভাই, আর ও পাঁচ। সত্যি মামা? মামার মুখ গোল, মামার মুখ ফরসা। মার মুখ গোল। ফরসা মামা হাসছে– না তো। একলা মুখ শুকিয়ে বসে আছে। কাছে একটাও তারা নেই। কেউ নেই। একলা। মার মত।

চার.

(কিছুক্ষণ পরে। গীতা বাইরের ঘরে। তার এলোমেলো খেলনাগুলো গোছাচ্ছে।)

মাঝখানে বরকন্যা, দুই পাশে বাজনাদারেরা। কনের সঙ্গে যাচ্ছে পালঙ্ক, আলমারি, টেবিল, সোফা-সেট। আর সেলাইকল, রেডিও? এবার বাজারে গেলে মাকে বলব, কিনে দেবে।

তাকের ওপরে থেকে শিবঠাকুর চেয়ে আছেন। একটা পা তুলেছেন বেঁকিয়ে। হাত ডমরূ। 'বম বম বাজে ডমরু... বাজে ডমরূ।

মার প্রেজেন্ট এইটে– মা কোথায় রাখবে? বাইরের ঘরের খেলনার তাকে, মাঝের ঘরের তাকে, না শোবার ঘরের আয়না-টেবিলের ওপরে? মা কি আবার আমায় ফিরিয়ে দেবে? আমার বরকন্যা ে তা পেলে ভারী খুশি হত। না থাক, ও মার, মা ওটা নিয়ে যা ইচ্ছে করবে।

খুলি এবার– এক, দুই, তিন... কাগজে বাঁধা বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। আমি একটা ভাল পিচ বোর্ডের বাক্স চাইলাম, দিল না।

প্রেজেন্ট। পদ্মফুল। ঝকঝকে সাদা ঝিনুক, একটি একটি করে লাগানো। ফুলের পাপড়ি, পাপড়ির আগায় সরু সোনালি দাগ কাটা। ফুলের মাঝখানে কি রোঁয়া রোঁয়া মতন লাগানো। হলদে রঙের। ফুলের কেশর।

দোকানদার বলছিল, বেশি টাকা দিলে আরো সুন্দর ফুল পাওয়া যেত, সোনা রূপো লাগানো। যাক, এটাও কি সুন্দর হয়নি?

এইটেকে নিয়ে যাই তাকের ওপর। শিবঠাকুরের কাছে। সব আলো নিবিয়ে দেব। খালি দেয়ালের সেই সাদা আলোটা জ্বলতে থাকবে– ঠিক শিবঠাকুরের গায়ে পড়বে আর আমার পদ্মফুলের ওপর।...

...ভাল হয়নি? নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। কী বল মিস্টার শিবঠাকুর। মা নিশ্চয় খুশি হবে, না?

আচ্ছা, এটাকে মাঝের ঘরে নিয়ে যাই। মা ঐখানে আগে যাবে। মার চোখে পড়বে।

> গীতা তাজমহলের প্রতিমাটি আস্তে করে তুলে একটা হাতে জড়িয়ে ধরে নামবার চেষ্টা করল। আরে– না না– উঃ– 'দড়াম্... তাজমহল নীচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গীতা কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চোখ দুটিতে ভয়, সব গেলর ভাব। এ কী হল? কেন হল? মার জন্মদিনের প্রেজেন্ট ভেঙে গেছে। বনুকাকার দেওয়া প্রেজেন্ট ভেঙে গেছে। মার সব ভালবাসা ভেঙে যাবে।

('প্রেজেন্ট' হাতে নিয়ে গীতা আস্তে আস্তে মাঝের ঘরের দিকে এগল। ঘরের চৌকাঠের কাছে পৌঁছে হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ টিপল।)

ঘর ভরতি আলো। বিছানা হয়নি। ছেলেদের ধোয়া জামা-কাপড় গাদা হয়ে পড়ে আছে অমনি। মা এলে রাগবে কুলিআর ওপর।

আরে এটা কী? দেয়ালের কোণে তিনকোণা ব্র্যাকেটের ওপর নতুন একটা জিনিস রাখা! ধপধপে সাদা। সাদা পাথর না রুপো? সবটা আলো গিয়ে পড়েছে ওর ওপরে। কত বড়, কী সুন্দর! কে আনল এটা?

হাত পাবে না ওখানে। খাটের বাজুর ওপর উঠে দেখি।

(তার 'প্রেজেন্ট'টা জানালার ওপর রেখে গীতা খাটের বাজুর ওপর উঠল নতুন জিনিসটি দেখবে বলে।)

কাছ থেকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। আরো বড় আর সাদা। কী এটা? বাড়ি না মন্দির? না না, এটা তাজমহল। আমাদের ইতিহাস বইয়ে ছবি আছে। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। আগ্রায় আছে। কে তৈরি করেছিল যেন–?

এটাও কি মার্বেল পাথর? হ্যাঁ তো– হাতে কী মোলায়েম লাগছে। ঠাণ্ডা লাগছে। কত টাকা দাম হয়তো–।

ওর নীচে একটা কাগজ। কি লেখা আছে সবুজ কালি দিয়ে।

'নূআবোউকে জন্মদিনে– বনু'। বনুকাকা দিয়েছেন? মার জন্য প্রেজেন্ট?

পিছন দিকে কুলিআ এসেছে। –গীতাদেঈ, ওতে হাত দিও না। এই একটু আগে বনুবাবু এসেছিলেন, রেখে গেছেন। মা দেখেননি।

– আচ্ছা আচ্ছা, যা, আমি জানি। তুই যা তো এখান থেকে।

বনুকাকা প্রেজেন্ট দিয়েছেন। চমৎকার জিনিস। দামী জিনিস। মা খুশি হবে। ভাল জিনিস বলে আর বনুকাকা দিয়েছেন বলে।

আমার জিনিস রয়েছে জানলার উপর। জানলার অন্ধকার কোণে। সাদা দেখাচ্ছে না, চমচকে দেখাচ্ছে না, ময়লা দেখাচ্ছে।

মাকে দেব না আমার প্রেজেন্ট? দিয়ে কী হবে? কোথায় তাজমহল আর কোথায় আমার ঝিনুক। মা রেখে দেবে কোন্ কোণে, আর খোঁজ রাখবে না। বনুকাকার জিনিসটা ভেঙে দিলে, ফেলে দিলে–?

না না, প্রেজেন্টটা বেশ সুন্দর। এ হচ্ছে বড়দের প্রেজেন্ট, আর আমার হচ্ছে ছোটদের প্রেজেন্ট। মা বনুকাকার প্রেজেন্ট পেয়ে খুশি হবে। আমার প্রেজেন্ট পেয়েও খুশি হবে।

এ জিনিসটা কি এখানে থাকবে? না বাইরের ঘরে নিয়ে যাব? চৌধুরীদের বাড়ির ওরা মহীশূর গিয়েছিল, তাদের আনা জিনিস বাইরের ঘরে আছে। নন্দভাই বম্বে থেকে কত জিনিস এনেছিলেন, সেও তো সব সেখানেই আছে। বনুকাকার জিনিস ওইখানে থাকবে, ভাল হবে।

এইখানে রাখব আমার জিনিস। মার চোখ আগে পড়বে এখানে।

(গীতা তাজমহলের প্রতিমাটি আস্তে করে তুলে একটা হাতে জড়িয়ে ধরে নামবার চেষ্টা করল।)

আরে– না না– উঃ– 'দড়াম্... (তাজমহল নীচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গীতা কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চোখ দুটিতে ভয়, সব গেলর ভাব।)

এ কী হল? কেন হল?

মার জন্মদিনের প্রেজেন্ট ভেঙে গেছে। বনুকাকার দেওয়া প্রেজেন্ট ভেঙে গেছে। মার সব ভালবাসা ভেঙে যাবে।

মা রাগবে। মা তো সবদিন রাগে, কিন্তু আজ আরো রাগবে। বনুকাকার জিনিস ভেঙে গেছে। জন্মদিনের সব আনন্দ চলে যাবে।

আর আমি মার জন্য প্রেজেন্ট এনেছিলাম। সে ওইখানে পড়ে আছে জানলার উপর। সেটাও ভেঙে দিই গে।

না না, আমি ওটা ভাঙিনি। আমি জেনে শুনে ভাঙিনি। আমি চাইনি বনুকাকার জিনিস ভেঙে যাক। বনুকাকার দেওয়া জিনিস পেলে মা বেশি খুশি হবে। আমি ওটা বাইরের ঘরে রাখতে যাচ্ছিলাম।

মা কি বুঝবে? বাইরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলাম কেন? আমার জিনিস এখানে রাখছিলাম কেন?

না, আমি জেনেশুনে কিছু করিনি। আমি বনুকাকার জিনিস ভাঙিনি। মা আমায় ভালবাসে। মা বুঝবে।

কিন্তু বনুকাকার জিনিস ভেঙে গেছে। বাড়ির জিনিস নয়। বাবার জিনিস নয়। মা খালি রাগবে না, মা ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

আমি কেন এখান থেকে নিয়ে যেতে গেলাম ওটা? মা আমার জিনিস আগে দেখবে বলে? কেন এমন করলাম? বনুকাকার জিনিস আমার চেয়ে ভাল, সুন্দর। মার জন্য বনুকাকার জিনিস আমার চেয়ে ভাল, সুন্দর।

এখুনি ওরা আসবে। মা ফিরবে। বনুকাকা আসবেন। মুখে মুচকি হাসি। বাবা আসবেন, কিন্তু তাঁর আসার সঙ্গে কি?

আমি কেন এমন করতে গেলাম?...

(দু'হাতে মুখ ঢেকে গীতা খাটের উপরে বসে পড়ল। চোখের জলে তার দুহাতের তেলো ভিজে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে।)

জুতোর মচমচ শব্দ। কে এল? বনুকাকা নয়। বাবার পায়ের শব্দ।

(গীতার বাবা ঘরে ঢুকে দেখলেন এ দৃশ্য। মুখে ক্লান্তি ও ব্যস্তভাব প্রতিদিনের মত।)

–এটা কী পড়ে আছে?

(উত্তর নেই।)

– এটা কী ভেঙেছে, জিগ্যেস করছি না?

– প্রেজেন্ট, বনুকাকা এনেছিলেন মার জন্য।

বাবা চুপ করে রইলেন। কী ভাবছেন। বাবা ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু বলছেন না কেন?

(কান্নার ভিতরেও গীতার মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা নূতন আশা মনে জাগল যেন।)

বাবা ফিরে যাচ্ছেন। জিগ্যেস করব? জিগ্যেস করব?....

– বাবা, বাবা–

– কী?

(গীতা দৌড়ে গেল বাবার কাছে)

– বাবা... মার জন্য প্রেজেন্ট এনেছ?

অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

লেখক পরিচিতি

১৯২৪ সালে কটকে কিশোরীচরণের জন্ম। ওড়িয়া ছোটগল্পের প্রথম সারির লেখক। তাঁর গল্প সংকলন 'ঠাকুর ঘর' সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। শিশু-মন ব্যাখ্যার এক অসাধারণ লেখক কিশোরীচরণ। ভারত সরকারের প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'ভাঙা খেলনা' নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

যখন বর্ষার মেঘ আসে কেরালায়, সেই জুলাই মাস হল আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সবচেয়ে ভাল সময়

কেরালার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় সবগুলো পর্যটন কেন্দ্রেই যে ব্যাপারটি সবসময় দেখেছি তা হল 'আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞতা'। আয়ুর্বেদ শব্দটি গঠিত হয়েছে দু'টি সংস্কৃত শব্দ মিলে। আয়ু মানে জীবন আর বেদ মানে বিজ্ঞান। এটি বিকল্প চিকিৎসার একটি পদ্ধতি যা ভারতে অনুশীলিত হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। আপনার বাজেট যা-ই হোক, কোন না কোন একটি আয়ুর্বেদিক কেন্দ্র মিলে যাবে আপনার পছন্দমত আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। আর আয়ুর্বেদিক মালিশ উপভোগের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে বর্ষাকাল।

আমি কোভালম বেড়াতে গিয়েছিলাম এরকম এক বর্ষার দিনে। কোভালম কেরালার আয়ুর্বেদিক গন্তব্যগুলোর মধ্যে আদর্শস্বরূপ। আয়ুর্বেদিক কেন্দ্রটিতে কেরালাশৈলীর লাল-ইটের সারি সারি কুটির আছে যেগুলো থেকে আরব সাগর দেখা যায়। থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় ভেষজ ওষুধপত্র। দুধ আর ঘি হল আয়ুর্বেদের কয়েকটি সাধারণ উপাদানের অন্যতম।

দৃষ্টিনন্দন সমুদ্রদৃশ্যের সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে চিকিৎসাকৰগুলোর একটিতে আমি প্রবেশ করি। একটি কাঠের টেবিলে আমি উপুড় হয়ে শোয়ার পর সুরেশ নামের একজন থেরাপিস্ট একবাটি ভেষজ তেল গরম করে আমার সারা শরীরে ঢেলে দেয়। আমি দেখতে পাই, বর্ষার ধূসর মেঘমালা দূরে আরব সাগরে মিশে যাচ্ছে আর সৈকতের নিকটবর্তী পাম গাছগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। বর্ষাকালে খোলা আকাশের নিচের চিকিৎসাকৰগুলোই আদর্শ স্থান। জানালা গলে ঠাণ্ডা, আর্দ্র, মৃদুমন্দ হাওয়া ঢোকার তালে তালে সুরেশ অভ্যস্ৰ হাতে তার কাজ শুরু করে। মালিশ স্থায়ী হয় দেড় ঘণ্টার মত– আর ঐ সময়টায় আমি ঝিমুচ্ছিলাম।

ভারতে বর্ষার বৃষ্টি নেয়ার প্রথম স্থান কেরালা। আমি যখন আমার গাড়িতে চলে আসছিলাম তখনো বৃষ্টি হচ্ছিল। কেরালার অন্যান্য অংশের মত কোভালমকেও বৃষ্টিতে চমৎকার দেখায়।

সংযুক্তা নিনান পর্যটক ॥ সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ** জানুয়ারি ২০১২

পথ-নির্দেশ: তিরুবন্তপুরম হল সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর ও রেলস্টেশন। সড়কপথে আপনি বাসে চড়ে কিংবা ক্যাব ভাড়া করে কোভালমে পৌঁছতে পারেন। তিরুবন্তপুরম থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১৬ কিমি

ঋতুরঙ

কেরালার মেঘ

সংযুক্তা নিনান

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

Triple Action — Omega3, Vitamin E, Oryzanol

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart Healthy Life

প্রশিৰণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংৰিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

আবুল ফজল পাইলট

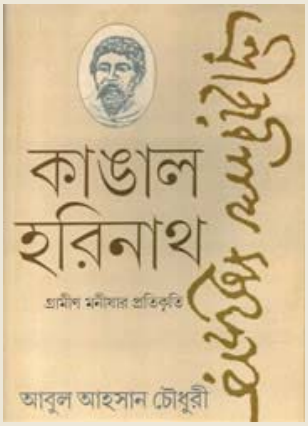

বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি ও সাহিত্যিক, সমাজসেবক, সর্বোপরি গ্রামীণ সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ হরিনাথ মজুমদার ১৮৩৩ সালের ২০ জুলাই (৫ শ্রাবণ ১২৪০) কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার কু-পাড়ায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাঙাল হরিনাথ নামে সমধিক পরিচিত। অতি অল্প বয়সে তিনি পিতৃমাতা কে হারান। তাঁর পিতার নাম হলধর মজুমদার, মাতা কমলিনী দেবী। কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে ভর্তির মধ্য দিয়ে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। মাতার স্নেহ ও পিতার যত্নে যে বয়সে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয়, সেই বয়সেই হরিনাথকে জীবিকার সন্ধানে তৎপর হতে হয়েছে। তবুও তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল নির্ভীকভাবে দেশ সেবার কঠিন ব্রতের পথ ধরে।

অবহেলিত গ্রামবাংলায় শিৰা বিস্ত্মারের জন্য হরিনাথ মজুমদার তাঁর বাল্যবন্ধু গোপাল কু-, যাদব কু-, গোপাল স্যানাল প্রমুখের সহায়তায় ১৮৫৫ সালের ১৩ জানুয়ারি কুমারখালীতে একটি 'ভার্নাকুলার বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে ঐ বিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে শিৰকতার মহান পেশায় নিয়োজিত হন। পরবর্তীকালে হরিনাথের সহায়তায় ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যা এখনও 'কুমারখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে কালের সাৰি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধারণা করা হয় এটাই তাঁর কর্মজীবনের প্রথম প্রয়াস।

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা জগতে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের অবদান অবিস্মরণীয়। অত্যাচারিত, অসহায়, নিষ্পেষিত কৃষক সম্প্রদায়কে রৰার হাতিয়ার হিসাবে তিনি সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। অল্প শিক্ষা নিয়েই তিনি দারিদ্র্য ও সচেতনতা বিষয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় লেখার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৮৫৭ সালে হাতে লেখা মাসিক *গ্রামবার্তা প্রকাশিকার* যাত্রা শুরু। এরপর ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মুদ্রাযন্ত্র থেকে পত্রিকাটি ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয়র নামে কুমারখালীতে নিজের বাড়িতে কাঙাল হরিনাথ একটি মুদ্রণযন্ত্র (এমএন প্রেস) স্থাপন করেন। এই মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পর থেকে *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* সাপ্তাহিক ও মাসিক আকারে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। এ পত্রিকার নামকরণ প্রসঙ্গে কাঙাল বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, 'গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম গ্রামবার্তা প্রকাশিকা।' পত্রিকাটি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসাবে ১৮ বছর (কারো মতে ২২ বছর) প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ মুদ্রিত হত। এছাড়াও জমিদার, মহাজন, নীলকর সাহেবদের শোষণের কেচ্ছাকাহিনি প্রকাশিত হত। *গ্রামবার্তা প্রকাশিকার* জনকল্যাণমূলক ভূমিকার কারণে *সোমপ্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুহিতৈষিণী* প্রভৃতি পত্রপত্রিকার বিশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছিল।

সম্পাদক, সাংবাদিকতা, সমাজসেবক– এসব পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ৪০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৮টি। এসবের মধ্যে *বিজয় বসন্ত* (১৮৫৯), *পদ্য পু-রীক* (১৮৬২), *চারু চরিত্র* (১৮৮৩), *কবিতা কৌমুদী* (১৮৬৬), *বিজয়া* (১৮৬৯), *কবিকল্প* (১৮৭০), *অক্রুর সংবাদ* (১৮৭৩), *সাবিত্রী* (১৮৭৪), *চিত্তচপলা* (১৮৭৬), *কাঙাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী* (১৮৮৭), *কৃষ্ণকালী লীলা* (১৮৯২), *মাতৃমহিমা* (১৮৯৭) উল্লেখযোগ্য। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: *প্রেম-প্রমীলা, মানুষ, জমিলকিশোর, অশোক*। প্যারীচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল* এবং কাঙাল হরিনাথের *বিজয় বসন্তকে* বাংলা ভাষার সবচেয়ে সার্থক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়।

দীর্ঘ আঠারো বছর *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* সম্পাদনার পর সাংবাদিকতা পেশা ত্যাগ করে কাঙাল হরিনাথ ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি আধ্যাত্মিক গুরম্ন ও বাউলসাধক লালন শাহের গানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ধর্মভাব প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে তিনি *কাঙাল ফিকির চাঁদের দল* নামে একটি বাউল সংগীতের দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অসম্ভব পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর গান রচনা করতেন। ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গানের প্রথম চার চরণ নিম্নরূপ:

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা তাই ডাকি তোমারে।
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
যারা পরে এল আগে গেল আমি রইলাম পড়ে।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা এবং মথুরানাথ প্রেস (এমএন প্রেস) কে ঘিরে উনিশ শতকে কুমারখালীতে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিম-ল গড়ে ওঠে যার মধ্যমণি ছিলেন বাউল সম্রাট লালন শাহ, *বিষাদ সিন্ধুখ্যাত* লেখক মীর মোশাররফ হোসেন, অৰয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৬ এপ্রিল ১৮৯৬ সালে এই ৰণজন্মা লেখক, শিৰানুরাগী, সঙ্গীতব্যক্তিত্ব, বাউল সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ, সমাজবিপ্লবী, সাময়িকপত্রসেবী হরিনাথ মজুমদার মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে *ইন্ডিয়ান মিরর* মন্তব্য করেছিল, 'নদীয়া জেলাবাসী একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারাল'।

আবুল ফজল পাইলট
সাহিত্যানুরাগী, ব্যাংকার

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪
গুলশান১, ঢাকা১২১২

বাড়ি ২৪, সড়ক ২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা১২০৫

সাল ২০১৫
সময়কাল সন্ধ্যা ৬.৩০

১৬ মে গুলশানের বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে বিনীতা করিমের একক চিত্র প্রদর্শনীতে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন ॥ ১৩ জুন আশরাফ মাহমুদের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

২৫ মে ওয়েস্টিন হোটেলে ইন্ডিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যালে ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার ॥ ১২ জুন ঢাকার বসুন্ধরা সিটির লেভেল ১৮র গোল্ডওয়াটার কনভেনশন সেন্টারে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক ২দি নের শিক্ষা মেলায় উদ্বোধন করছেন ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার

১২ জুন বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর বাংলাদেশের পরিচালক মাসুদ করিমের তথ্যচিত্র 'কৃষ্ণকলি'র প্রদর্শনী ॥ ২৬ জুন ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন, ঢাকা, ডাউনটাউন রোটারি ক্লাব এবং ঢাকা ব্লড ডোনার্স এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় তামিল সঙ্গম ইনকর্পোরেশন আয়োজিত রক্তদান শিবির

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত সরকারের দেওয়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত কয়েকজনের হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra July 2015

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপৰকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পৰে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/fa

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত